অশনি-সংকেত

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অমর সাহিত্য প্রকাশন
৭ টেমার লেন, কলিকাতা ৯

ভূমিকা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি অপ্রকাশিত সাহিত্য-কীর্তি 'অশনি-সংকেত' আজ প্রকাশিত হোল। এটি অধুনালুপ্ত 'মাতৃভূমি' পত্রিকায় (মাঘ ১৩৫০—মাঘ ১৩৫২) ধারাবাহিক ভাবে মুদ্রিত হয়। পরে মাতৃভূমির অবলুপ্তির পর গ্রন্থটির রচনাও সেইখানেই থেমে যায়।

অশনি-সংকেতে ১৩৫০-এর মন্বন্তরের জলন্ত দৃশ্য আঁকা রয়েছে। শহর থেকে দূরে গ্রামাঞ্চলের জনগণের অবর্ণনীয় দুঃখ, দুর্দশা ও লাঞ্ছনার চিত্র যথাযথ বর্ণিত হয়েছে। সেই সময়কার জীবন্ত দৃশ্য এই গ্রন্থটির মধ্যে পরিদৃশ্যমান।

গ্রন্থকারের আকস্মিক মহাপ্রয়াণে তাঁর কাগজপত্র নষ্ট হয়। এতদিন পরে অনেক পরিশ্রমে এর প্রতিলিপি সংগ্রহ বহু চেষ্টায় করতে হয়েছে। এই কাজে আমাকে সহায়তা করেছেন শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত। পুরাতন 'মাতৃভূমি'র ফাইল দিয়ে সহায়তা করেছেন 'দৈনিক বসুমতী' সম্পাদক শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী ও অধুনালুপ্ত 'বঙ্গশ্রী'র সহকারী সম্পাদক শ্রীরণজিৎকুমার সেন। এঁদের আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

"আরণ্যক"
ব্যারাকপুর—২৪ পরগণা
২৮ ভাদ্র ১৩৬১

রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

অশনি-সংকেত

দীর ঘাটে তালগাছের গুঁড়ি দিয়ে ধাপ তৈরী করা হয়েছে। দুটি স্ত্রীলোক স্নানরতা। কটি স্ত্রীলোক অপেক্ষাকৃত অল্পবয়েসী। ত্রিশের সামান্য কিছু নিচে হয়তো হবে। অপরটি প্রৌঢ়া।

প্রৌঢ়া বললে—ও বামুন-দিদি, ওঠো—কুমীর এয়েচে নদীতে—

অপরা বধূটির উঠবার ইচ্ছে নেই জল থেকে এত তাড়াতাড়ি। সে কোনো জবাব না দিয়ে গলাজলে দাঁড়িয়ে রইল।

—বামুন-দিদিকে নিয়ে আর কক্ষনো যদি নাইতে আসি!

—রাগ কোরো না পুঁটির মা—সত্যি বলচি জলে নামলে আমার আর ইচ্ছে করে না যে ঠি—

—কেন বামুন-দিদি?

—যে গাঁয়ে আগে ছিলাম সেখানে কি জলকষ্ট। সে যদি তুমি দেখতে! একটা বিল ল, তার জল যেতো শুকিয়ে। জষ্টি মাসে এক বালতি জলে নাওয়া, অথচ তার নাম ছিল দ্মবিল—

বধূটি হি হি করে হেসে ঘাড় দুলিয়ে বললে—পদ্মবিল! দ্যাখো তো কি মজা পুঁটির মা? ত্তর মাসে জল যায় শুকিয়ে। নাম পদ্মবিল—

এই সময় একটি কিশোরী জলের ঘাটে নামতে নামতে বললে—অনঙ্গ-দিদি, তোমার ড়ীতে কলু তেল দিতে এসে দাঁড়িয়ে আছে—শীগ্‌গির যাও, আমায় বলছিল, আমি বললাম টে যাচ্চি—ডেকে দেবো এখন—

অনঙ্গ-বৌয়ের হাসি তখনও থামে নি। সে বললে—তোর বৌদিদির কাছে গল্প করছি দ্মবিলের—জল থাকে না চত্তির মাসে—নাম পদ্মবিল—

মেয়েটি বললে—সে কোথায় অনঙ্গ-দি?

—সেই যেখানে আগে ছিলাম—সেই গাঁয়ে—

—সে কোথায়?

—ভাতছালা বলে গাঁ। অম্বিকপুরের কাছে—

—তোমার শ্বশুরবাড়ী বুঝি?

—না। আমার শ্বশুরবাড়ী হরিহরপুর, নদে জেলা। সেখানে বড্ড চলা-চলতির কষ্ট সেখান থেকে বেরুলাম তো এলাম ওই পদ্মবিলের গাঁয়ে—

—তারপর?

—তারপর সেখান থেকে এখানে।

অনঙ্গ জল থেকে উঠে বাড়ী চলে গেল।

গ্রামখানিতে এরাই একমাত্র ব্রাহ্মণ-পরিবার, আর সবাই কাপালী ও গোয়ালা। নদীর এ-গ্রাম বেশি দিনের নয়। বসিরহাট অঞ্চলের চাষী, জমি নোনা লেগে নষ্ট হওয়াতে ান থেকে আজ বারো-তেরো বছর আগে কাপালীরা উঠে এসে নদীতীরের এই অনাবাদী ত জমি সস্তায় বন্দোবস্ত করে নিয়ে গ্রামখানা বসিয়েছিল। তাই এখনও এর নাম নতুন কেউ কেউ বলে চর পোলতার নতুন পাড়া।

অনঙ্গদের বাড়ী গোয়ালপাড়ার প্রান্তে, দুখানা মেটে ঘর। খড়ের ছাউনি, একখ দোচালা রান্নাঘর। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন উঠানের ধারে ধারে পেঁপে ও মানকচু গাছ। চা দিশি কুমড়োর লতা দেওয়া হয়েচে কঞ্চি দিয়ে, রান্নাঘরের পাশে গোটাকতক বেগুন গা চেঁড়স গাছ।

অনঙ্গ এসে দেখল বদ্যিনাথ কলু বড় একটা ভাঁড়ে প্রায় আড়াই সের খাঁটি সর্ষে-তে এনেচে। তেল মাপা হয়ে গেলে বদ্যিনাথ বললে—মা-ঠাকরুণ, আজ আর সর্ষে দেবে নাকি ?

—উনি বাড়ী এলে পাঠিয়ে দেবো। এখন এই তেলে এক মাস চলে যাবে—

—আর পয়সা ছ'টা ?

—কেন খোল তো নিয়েচ, আবার পয়সা কেন ?

—ছটা পয়সা দিতে হবে সর্ষে ভাঙানির মজুরি। খোলের আর কত দাম মা-ঠাকরুণ তাতে আমাদের পেট চলে ?

—আচ্ছা উনি বাড়ী এলে পাঠিয়ে দেবো।

অনঙ্গ-বৌয়ের দুটি ছেলে। বড়টির বয়েস এগারো বছর, তার ডাকনাম পটল। ছোট আট বছরের। তাকে এখনও খোকা বলেই ডাকা হয়। পটল খুব সংসারী ছেলে—এ ত তরিতরকারীর ক্ষেত সে-ই করেচে বাড়ীতে। এখন সে উঠোনের একপাশে বসে বে বাঁধবার জন্যে বাঁশের বাখারি চাঁচছিল। ওর মা বললে—পটলা, ওসব রাখ, এত বেলা হো দুধ দেয় নি কেন দেখে আয় তো ?

পটল বাখারি চাঁচতে চাঁচতেই বললে—আমি পারবো না।

—পারবি নে তো কে যাবে ? আমি যাবো দুধ আনতে সেই কেষ্টদাসের বাড়ী ?

—আহা, ভারি তো বেলা হয়েচে, এখন বেড়াটা বেঁধে নিই, একটু পরে দুধ এনে দেবো-

—না এখুনি যা।

—তোমার পায়ে পড়ি মা। বাবা বাড়ী এলে আর বেড়া বাঁধতে পারবো না। এই দ্যাে ছাগল এসে আজ বেগুন গাছ খেয়ে গিয়েচে।

খোকা এসে বললে—মা, আমি দুধ আনবো ? দাদা বেড়া বাঁধুক—

অনঙ্গ সে কথা গায়ে না মেখে বললে—খোকা, গাছ থেকে দুটো কাঁচা ঝাল তো তোদের মুড়ি মেখে দি—

খোকা জেদের সুরে বললে—আমি দুধ আনবো না মা ?

—না।

—কেন. আমি পারি নে !

—তোকে বিশ্বাস নেই—ফেলে দিলেই গেল।

—তুমি দিয়ে দ্যাখো। না পারি, কাল থেকে আর দিও না।

—কাল থেকে তো দেবো না, আজকের দু'সের দুধ তো বালির চড়ায় গড়াগড়ি খাক তোর সর্দারি করবার দরকার কি বাপু ? দুটো কাঁচা ঝাল তুলতে বললাম, তাই তোল্ !

এমন সময়ে পটলের বাবা গঙ্গাচরণ চক্কত্তি বাড়ী ঢুকে বললে—কোথায় গেলে—এই মাছ ধরো, দীনু তীওর দিলে, বললে সাত-আটটা মাছ পেয়েচি—এটা ব্রাহ্মণের সেবায় লাগুক বেশ বড় মাছটা—না ? এই পটলা পড়া গেল, শুনো গেল, ও কি হচ্চে সকালবেলা ?

পটল মৃদু প্রতিবাদের নাকিসুরে বললে—সকালবেলা বুঝি ? এখন তো দুপুর হয়ে ন—

—না, তা হোক, ব্রাহ্মণের ছেলে, বাঁশ-কঞ্চি নিয়ে থাকে না রাতদিন !

—ছাগল যে বেগুন গাছ খেয়ে যাচ্ছে ?

—যাক গে খেয়ে। উঠে আয় ওখান থেকে। ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে কী কাপালীর লের মত দা-কুড়ুল হাতে থাকবি দিনরাত ?

অনঙ্গ বললে—কেন ছেলেটার পেছনে অমন করে লাগছ গা ? বেড়া বাঁধছে বাঁধুক না ? টির দিন তো।

গঙ্গাচরণ চক্কত্তি বললে—না, ওসব শিক্ষে ভাল না। ব্রাহ্মণের ছেলে, ও রকম কি ভালো ?

পটল নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে বেড়া বাঁধা রেখে উঠে এল।

অনঙ্গ স্বামীকে বললে—ওগো, একবার হরিহরের হাটে যাও না।

—কেন ?

—একবার দেখে এসো নতুন গুড় উঠলো কিনা।

—সে তুমি ভেবো না, আমার গুড় কিনতে হবে না। এখান থেকেই পাওয়া যাবে। াই ভক্তি করে।

বাইরে থেকে কে ডাকলে—চক্কত্তি মশায়, বাড়ী আছেন ?

গঙ্গাচরণ বললে—কে রামলাল ? দাঁড়াও—

আগন্তুক ম্যালেরিয়া রোগী, তার চেহারা দেখেই বোঝা যায়। গঙ্গাচরণ বাড়ীর বাইরে সেতেই সে নিজের ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে বললে—একবার হাতখানা দেখুন তো ?

গঙ্গাচরণ ধীরভাবে বললে—অমন করে হাত দেখে না। বসো, ঠাণ্ডা হও। হেঁটে এসেচ, ড়ী চঞ্চল হবে যে। বাপু এ কোদাল-কোপানো নয় ! এসব ডাক্তার-বদ্যির কাজ, বড্ড ঠাণ্ডা থায় করতে হয়। কাল কেমন ছিলে ?

—রাত্রিতে জ্বর-জ্বর ভাব, শরীর যেন ভারী পাথর—

—কি খেয়েছিলে ?

—দুটো ভাত খেয়েছিলাম চক্কত্তি মশাই, আর কি খাবো বলুন, তা ভাত মুখে ভাল গেলো না।

—যা ভেবেছি তাই। ভাত খেলে-কি বলে ? জ্বর সারবে কি করে ?

—আর খাবো না।

—সে তো বুঝলাম—যা খেয়ে ফেলেচ, তার ঠ্যালা এখন সামলাবে কে ? বোসো, দুটো ড় নিয়ে যাও—শিউলিপাতার রস আর মধু দিয়ে খেও, দ্যাখো কেমন থাকো—

ওষুধ নিয়ে রামলাল চলে যাচ্ছিল, গঙ্গাচরণ ডেকে বললে—ওহে রামলাল, ভালো কথা, বার নতুন সর্ষে হয়েছে ক্ষেতে ? দু-কাঠা পাঠিয়ে দিও তো। আমি বাজারের তেল খাইনে পু, সর্ষে দিয়ে কলুবাড়ী থেকে ভাঙিয়ে নিই।

—যে আজ্ঞে। আমার ছেলে ওবেলা দিয়ে যাবে'খন। তেমন সর্ষে এবার হয় নি চক্কত্তি শাই। বিষ্টি হওয়াতে সর্ষে গাছে পোকা ধরে গেল কার্তিক মাসে।

রামলালকে বিদায় দিয়ে গঙ্গাচরণ সগর্বে স্ত্রীর কাছে বলল—দেখলে তো ? যাকে যা বো, না বলুক দিকি কেউ ? সে জো নেই কারো।

স্বামীগর্বে অনঙ্গ-বৌয়ের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সে আদরের সুরে বললে—এখন নেয়ে নাও দিকি ? বেলা তেতপ্পরে হয়েচে। সেই কখন বেরিয়েচ—দুটো ছোলা-গুড় মুখে দিয়ে নাও—এখুনি তো তোমার ছাত্তরের দল আসতে শুরু করবে। তেল দিই—

নদীতে স্নান সেরে এসে জলখাবার অর্থাৎ ছোলা ভিজে ও এক টুকরো আখের পাটালি খেতে খেতে গঙ্গাচরণের মুখ তৃপ্তিতে ভরে উঠলো। অনঙ্গ জিজ্ঞেস করলে—হ্যাগা, পাঠশালা খোলার কথা কিছু হোল বিশ্বেস মশায়ের সঙ্গে ?

—সব হয়ে যাবে। ও'রা নিজেরা ঘর বেঁধে দেবেন বললেন—

—ছেলে হবে কি রকম ?

—দুটো গাঁয়ের ছেলেমেয়ে পাচ্চি—তাছাড়া প্রাইবিট পড়ার ছাত্তর তো আছেই হাতে। এ দিগরে লেখাপড়া জানা লোক কোথায় পাবে ওরা ? সকলের এখন চেষ্টা দাঁড়িয়েচে যাতে আমি থাকি।

—সে তো ভালই। উড়ে উড়ে বেড়িয়ে কি করবে—এখানেই থাকা যাক। আমার বড্ড পছন্দ হয়েচে। কোন জিনিসের অভাব নেই। মুখের কথা খসতে যা দেরি—

—রও, সব দিক থেকে বেঁধে ফেলতে হবে ব্যাটাদের। চাষা গাঁ, জিনিস বলো পত্তর বলো, ডাল বলো, মুলো বেগুন বলো—কোনো জিনিসের অভাব হবে না। এ গাঁয়ে পুরুত নেই ওরা বলচে, চক্কত্তি মশাই, আমাদের লক্ষ্মীপুজো, মনসা পুজোটাও কেন আপনি করুন না ?

—সে বাপু আমার মত নেই।

—কেন—কেন ?

—কাপালীদের পুরুতগিরি করবে ? শুদ্দুর-যাজক বামুন হোলে লোকে বলবে কি ?

—কে টের পাচ্ছে বলো ? এ অজ পাড়াগাঁয়ে কে দেখতে আসচে—তুমিও যেমন !

—কিন্তু ঠাকুরপুজো জানো ? না জেনে পুজো-আচ্চা করা—ওসব কাঁচা-খেকো দেবতা, বড্ড ভয় হয়। ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করা—

—অত ভয় করলে সংসার করা চলে না। পাঁজিতে আজকাল ষষ্ঠীপুজো মাকালপুজো সব লেখা থাকে—দেখে নিলেই হবে।

—তুমি যা বোঝো—

—কোনো ভয় নেই বৌ—তুমি দেখে নিও, এ ব্যাটাদের সব দিক থেকে বেঁধে ফেললে কোনো ভাবনা হবে না আমাদের সংসারে।

অনঙ্গও তা জানে। স্বামীর ক্ষমতা সম্বন্ধে তার অসীম বিশ্বাস। কিন্তু কথা তা নয়—এক জায়গায় টিকে থাকতে পারলে সব হতে পারে, কিন্তু স্বামীর মন উড়ু-উড়ু, কোনো গাঁয়ে এক বছরের বেশি তো টিকে থাকতে দেখা গেল না। বাসুদেবপুরেই বা মন্দ ছিল কি ? একটু সুবিধে হয়ে উঠতে না উঠতে উনি অমনি বললেন—চলো বৌ, এখানে আর মন টিকচে না।

অমন করে উড়ে উড়ে বেড়ালে কি কখনো সংসারে উন্নতি হয় ? তবে একথা ঠিক বাসুদেবপুরে শুধু পাঠশালায় ছেলেপড়ানোতে মাসে আট-দশ টাকা আয় হত।—আর এখানে জিনিসপত্র পাওয়া যায় কত ! উন্নতি হয় তো এখান থেকেই হবে। উনি যদি মন বসিয়ে থাকেন তবে সবই হতে পারে সে জানে।

একটু পরে চার-পাঁচটি ছোট ছোট ছেলে শ্লেট বই নিয়ে দড়িবাঁধা দোয়াত ঝুলিয়ে গঙ্গাচরণের কাছে পড়তে এল।

গঙ্গাচরণ বললে, আমি এই খেয়ে উঠলাম, একটু শুয়ে নিই—তোরা পুরোনো পড়া দ্যাখ ততক্ষণ। ওরে নসু, তোদের বাড়ীতে বেগুন হয়েছে?

একটি ছোট ছেলে বললে—হ্যাঁ গুরুমশায়—

গঙ্গাচরণ ধমক দিয়ে বললে—গুরুমশায় কি রে? সার্ বলবি। শিখিয়ে দিইনি না? বল্—

ছেলেটি ভয়ে ভয়ে বললে—হ্যাঁ সার্—

—যা গিয়ে বসে লিখগে—বেগুন নিয়ে আসবি কাল, বুঝলি?

—আনবো সার্।

ছেলে ক'টি দাওয়ায় বসে এমন চীৎকার জুড়ে দিলে যে তাদের ত্রি-সীমানায় কারো নিদ্রা বা বিশ্রাম সম্পূর্ণ অসম্ভব। অনঙ্গ স্বামীকে বললে—ওগো তোমার ছাত্তরেরা যে কানের পোকা বের করে দিলে। ওদের একটু থামিয়ে দাও—

গঙ্গাচরণ হেঁকে বললে—এই! পড়া থাক এখন, সবাই শটকে কড়াংকে লিখে রাখ শেলেটে। আমি ঘুমিয়ে উঠে দেখবো।

তারপর স্ত্রীকে খুশির সুরে বললে—ছটা হয়েচে, আরও সাত-আটটা কাল আসছে পুব পাড়া থেকে। ভীম ঘোষ বলছিল, বাবাঠাকুর, আমাদের পাড়ার সব ছেলে আপনার কাছে পাঠাবো। নেতা কাপালীর কাছে পড়লে যদি ছেলে মানুষ হোত, তা হোলে আর ভাবনা ছিল না। ব্রাহ্মণ হোল সমাজের সব কাজের গুরুমশায়। কথায় বলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।

গঙ্গাচরণ মন দিয়ে ছেলে পড়ায় বটে। ঘুম থেকে উঠে সে ছেলেদের নিয়ে অনেকক্ষণ ব্যস্ত রইল—কাউকে নামতা পড়ায়, কাউকে ইংরেজী ফাস্ট বুক পড়ায়—ফাঁকিবাজ গুরুমশায় কেউ তাকে বলতে পারবে না। বেলা বেশ পড়ে গেলে সে ছাত্রদের ছুটি দিয়ে লাঠি নিয়ে বাইরে বেরুবার উদ্যোগ করতে অনঙ্গ এসে বললে—ওগো, কিছু খেয়ে যাবে না—আজ দু'বাড়ী থেকে দুধ পাঠিয়ে দিয়েছিল, একটু ক্ষীর করেচি···

বৈকালিক জলযোগ অনেকদিন অদৃষ্টে ঘটে নি।

নানা অবস্থা বিপর্যয়ের মধ্যে আজ তিনটি বছর কাটচে স্বামী-স্ত্রীর। সুতরাং স্ত্রীর কথা গঙ্গাচরণের কানে একটু নতুন শোনালো।

স্ত্রীকে বললে—ছেলেদের দিয়েচ?

—সে ভাবনা তো তোমার করতে হবে না, তুমি খেয়ে নাও—

খেতে খেতে পরম তৃপ্তির সঙ্গে সে স্ত্রীকে বললে—এখানে আছি ভালই, কি বল?

অনঙ্গ-বৌয়ের মুখে সমর্থনসূচক মৃদু হাসি দেখা দিল, সে কোনো উত্তর করল না। লক্ষ্মীর কৃপা যদি হয়ই, মুখে তা নিয়ে বড়াই করতে নেই। তাতে লক্ষ্মী রাগ করেন।

গঙ্গাচরণ খানিকটা ক্ষীরসুদ্ধ বাটিটা স্ত্রীর হাতে দিয়ে বললে—এই নাও—

—ও কি! না-না—সবটা খেয়ে ফেল—

—তুমি এটুকু—

—আমার জন্যে আছে গো আছে, সে ভাবনা তোমায় করতে হবে না—

—তা হোক। আর খাবো না—এবার বিশ্বেস মশায়ের বাড়ী যাই। পাকাপাকি করে আসি।

—বেশি দেরি কোরো না—এখেনে নাকি বুনো শুওর বেরোয় সন্দের পর। আমার বড্ড ভয় করে বাপু—

গঙ্গাচরণ ছায়া-ভরা বিকেলে মাঠের রাস্তা বেয়ে গন্তব্যস্থানে যেতে যেতে কল্পনাচক্ষে তার ভবিষ্যৎ গৃহস্থালীর ছবি আঁকছিল। বেশ লাগে ভাবতে। এই সব মাঠে ভাল চাষের জমি পাওয়া যায়, যদি কিছু জমি তাড়ংগাড়ার বাঁড়ুয্যে জমিদারের কাছ থেকে বন্দোবস্ত নেওয়ার যোগাযোগ ঘটে, যদি বিশ্বাস মশায়কে বলে কয়ে একখানা লাঙল করা যায় তবে ভাত-কাপড়ের ভাবনা দূরে হবে সংসারের।

অনেকদিন থেকে সে-জিনিসের ভাবনাটা চলে আসচে।

হয়তো ভগবান ঠিক জায়গাতেই নিয়ে এসে ফেলেচেন এতদিনে।

বিশ্বাস মশায়ও যথেষ্ট আগ্রহ দেখালেন গঙ্গাচরণকে এ-গ্রামে বসাবার জন্যে। বললেন—আপনারা আমাদের মাথার মণি—আমি আপনাকে সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।

—একটা পাঠশালার বন্দোবস্ত আপনি করে দিন—

—সব হয়ে যাবে—আপাতত যাতে আপনার চলে তার ব্যবস্থা করতে হবে তো? বাড়ীতে খেতে ক'জন?

—আমার স্ত্রী ও দুটি ছেলে—

বিশ্বাস মশায় মনে মনে হিসেব করে বললেন—ধরুন মাসে দশ আড়ি ধান—পনেরো কাঠা চাল হলে আপনার মাস চলে যাবে—কি বলেন?

—হ্যাঁ, তাই ধরুন—

—আর সংসারের ডালডুল, তেল নুন—ও হয়ে যাবে। পুরুতগিরিটাও ধরুন—

—সে তো ঠিক করেই রেখেচি—সংস্কৃত জিনিসটা কষ্ট করে শিখতে হয়েচে—ও বড় শক্ত জিনিস, সকলের মুখ দিয়ে কি বেরোয়? এই শুনুন তবে—ধ্যায়ন্নিত্যং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং—ইয়ে—পরশুমৃগবরা ভীতিহস্তা—ইয়ে রত্নকল্পজ্বলাং—

—বাঃ, বাঃ—

—এটা কি বলুন তো?

—কি করে জানবো বলুন—আমরা হচ্ছি চাষীবাসী গেরস্ত, আংক আঙ্ক পর্যন্ত আমাদের বিদ্যে। আর শিশুবোধক। পড়েচেন শিশুবোধক?

পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল
কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল—

দেখুন কদ্দিন আগে পড়েচি, ভুলি নি। সব মনে আছে।

গঙ্গাচরণ উৎসাহের সঙ্গে ঘাড় নেড়ে বললে—বেশ—বেশ—

বিশ্বাস মশায় হৃষ্টমনে বললেন—বাবা মারা গেলেন অল্প বয়সে। সংসারে দুটি নাবালক ভাই—জমিজমা যা ছিল এক জ্ঞাতি খুড়ো সব নিজের বলে লিখিয়ে নিলে জরিপের সময়—

—সে কোথায়?

—চিত্রাঙ্গপুর, ডাবতলীর কাছে। ডাবতলীর গরুর হাট ও-দিগরে নামকরা। অত বড় গরুর হাট এ জেলায় নেই।

—সেখান থেকে বুঝি এখানে এলেন ?

—হ্যাঁ, দেখলাম ও গাঁয়ে আর সুবিধে হবে না। মনে মনে বললাম, মন, পৈতৃক ভিটের মায়া ছাড়। এখানে কি না খেয়ে মরবো ? আমি আর বিষ্টু সা। বিষ্টু সা আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু। আমার সঙ্গে গাঁ ছেড়ে যেতে রাজী হোল। তখন খুঁজতে বেরিয়ে পড়লাম দু'জনে। এ বলে ওখানে জমি সস্তা, ও বলে ওখানে জমি সস্তা। কিন্তু মশায় জমি পাওয়াই যায় না। সস্তা তো কোথাও দেখলাম না। পঞ্চাশ টাকার কমে কোথাও জমি নেই—

—ধানের জমি—

বিশ্বাস মশায়ের অন্দরমহলে এই সময় শাঁকে ফু' পড়লো, গঙ্গাচরণ ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠে বললে—ও, সন্দে হয়ে গেল—আমি এবার যাই—এবার সন্দে-আহ্নিক করতে হবে কিনা ?

আসল কথা, স্ত্রীর বুনো-শুওর সংক্রান্ত সতর্কবাণী তার মনে পড়েচে। নতুন গাঁয়ের আশেপাশে এখনও যথেষ্ট বনজঙ্গল, অন্ধকারে চলাফেরা না করাই ভালো। সাবধানের মার নেই।

বিশ্বাস মশায় বললেন—তা বিলক্ষণ! এখানে আমার এই বাইরের ঘরেই সন্দে-আহ্নিকের জায়গা করে দিই। গঙ্গাজল আছে বাড়ীতে। আমরা জেতে কাপালী বটে, কিন্তু আমাদের বাড়ীর মেয়েরা স্নান না করে মুখে জলটুকু দেয় না—সব মাজাঘষা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ব্রাহ্মণের সন্দে-আহ্নিক হোলে এ বাড়ীতে, বাড়ী আমার পবিত্র হয়ে যাবে। তারপর একটু জল মুখে দিন—

—না না, সে সবে এখন আর দরকার নেই—যখন এখানে আছি, তখন সবই হবে—উঠি এখন—গঙ্গাচরণ খুব ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

বিশ্বাস মশায় বললেন—আমার গল্পটা শুনে যান। তারপর তো—

—আচ্ছা ও আর একদিন শুনবো এখন। সন্দে-আহ্নিকের সময় হয়ে গেলে আমার আর কোনোদিকে মন থাকে না। ব্রাহ্মণের ছেলে, সংস্কৃত পড়িচি—নিত্যকর্মগুলো তো ছাড়তে পারবো না—

গঙ্গাচরণের কণ্ঠস্বর ভক্তিতে গদগদ হয়ে উঠলো।

গঙ্গাচরণের পাঠশালা বেশ জমে উঠেছে।

আজ সকালে সাত-আটটি নতুন ছাত্র দড়ি-বাঁধা মাটির দোয়াত হাতে ঝুলিয়ে এসে উপস্থিত। গঙ্গাচরণ তাদের নিয়ে বেলা দুপুর পর্যন্ত ব্যস্ত রইল। ছাত্রদের মধ্যে সকলেই স্থুলবুদ্ধি, এদের বাপ-ঠাকুরদাদা কখনও নিজের নাম লিখতে শেখে নি, জমি চষে কলা বেগুন করে জীবিকানির্বাহ করে এসেচে, লেখাপড়া শেখাটা এদের বংশে একেবারে অভিনব পদার্থ।

গঙ্গাচরণ বললে, সকাল থেকে চেষ্টা করে ক'য়েক আঁকুড়ি দিতে শিখলি নে ? তা শখীব কোথা থেকে ? এখন ওসব আঙুল সোজা হ'তে ছ'মাস কেটে যাবে। লাঙলের মুঠি ধরে ধরে আড়ষ্ট হয়ে আছে যে। এই ভুতো, যা একটু তামাক সেজে নিয়ে আয় দিকি ! রান্নাঘরে তোর কাকিমার কাছ থেকে আগুন নিয়ে আয়—

দুটি ছাত্র ছুটলো তখুনি আগুন আনতে।

গঙ্গাচরণ হেঁকে বললে—এই ! যাবার দরকার কি তোমার ?—ভুতো একাই পারবে।

অন্য একটি ছেলের দিকে চেয়ে বললে—তোর বাবা বাড়ী আছে ?

ছেলেটি বললে—হ্যাঁ সার্—

—কাল যেন আমায় এসে কামিয়ে যায় বলে দিস্—

—সার্, বাবা কাল ভিন্‌গাঁয়ে কামাতে গিয়েচে।

—এলে বলে দিস এখানে যেন আসে।

অনঙ্গ-বৌ ডেকে পাঠালে বাড়ীর মধ্যে থেকে।

গঙ্গাচরণ গিয়ে বললে—ডাকছিলে কেন ?

অনঙ্গ বললে—শুধু ছেলেদের নিয়ে বসে থাকলে চলবে ? কাঠ ফুরিয়েছে তার ব্যবস্থা দ্যাখো—

গঙ্গাচরণ আশ্চর্য হবার সুরে বললে—সে কি ? এই যে সেদিন কাঠ কাটিয়ে দিলাম এক-গাড়ী। সব পুড়িয়ে ফেললে এর মধ্যে ?

অনঙ্গ রাগ করে বললে—কাঠ কি খাবার জিনিস যে খেয়ে ফেলেচি ? রোজ এক হাঁড়ি ধান সেদ্ধ হবে, চিঁড়ে কোটা হোল দশ-বারো কাঠা—এতে কাঠ খরচ হয় না ?

অনঙ্গ কথাটা একটু গর্ব ও আনন্দের সুরেই বলল, কারণ সে যে দরিদ্র ঘর থেকে এসেচে, সেখানে একদিনে এত ধানের চিঁড়েকোটারূপ সচ্ছলতা স্বপ্নের বিষয় ছিল—যে-দারিদ্র্যের মধ্যে এসে পড়েছিল প্রথম শ্বশুরবাড়ী এসে, এখন সে-কথা ভাবতেও যেন পারা যায় না।

বাসুদেবপুর এসে আগের চেয়ে অবিশ্যি অবস্থা ভালই হয়েছিল। তবে সে গ্রামে শুধু পাঠশালার ছেলে পড়ানোর আয় ছিল সম্বল, জিনিসপত্র কেউ দিত না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এখনও বাসুদেবপুর নিয়ে কথা ওঠে।

সেদিনই দুপুরের পর আহারান্তে গঙ্গাচরণ একটু বিশ্রাম করছিল, অনঙ্গ এসে বললে—বাসুদেবপুর আবার যাবার ইচ্ছে আছে ?

গঙ্গাচরণ বিস্ময়ের সঙ্গে বললে—কেন বল দিকি ?

—না তাই বলচি। সেখানকার ঘরখানা তো এখনও রেখেই দিয়েচ, বিক্রি করেও তো এলে না।

—তখন কি জানি এখানে বেশ জমে উঠবে ?

—ভাতছালার জন্যে কিন্তু মন কেমন করে। সেখানকার পদ্মবিলের কথা মনে আছে ?

—পদ্মবিল তো ভালই ছিল। বেশ জল।

—চত্তির মাসে জল থাকতো না বটে, কিন্তু না থাকুক বাপু, গাঁখানার লোকগুলো ছিল বড্ড ভাল। তিনদিকে মাঠ, একদিকে অতবড় বিল, সুন্দর দেখতে ছিল।

—তুমি তো বলেছিলে পদ্মবিলের ধারে ঘর বাঁধবে।

—ভেবেছিলাম নতুন খড় উঠলেই পদ্মবিলের ধারে ঘর তৈরি করবো। লোকজনকে বলেও রেখেছিলাম। সস্তায় খড় দিত।

অনঙ্গ আপন মনে হিসেব করবার ভঙ্গিতে বললে আঙুল গুনে গুনে—হরিহরপুরে বিয়ে হোল। সেখান থেকে ভাতছালা, তারপর বাসুদেবপুর, তারপর এখানে। অনেক দেশ বেড়ানো হোল আমাদের—কি বলো ?

গঙ্গাচরণ গর্বের সুরে বললে—বলি হরিহরপুর গাঁয়ের ক'জন এত দেশ দেখে বেড়িয়েচে ?

অনঙ্গ বললে—শুধু দেখে বেড়ানো কি বলো গো ! বাসও করা হয়েচে।

—নিশ্চয়ই।

—কিন্তু একটা কথা বাপু…

—কি ?

—এ গাঁ ছেড়ে অন্য কোথাও আর যেও না।

—যদ্দিন চলা-চলতির সুবিধে থাকে, থাকবো বৈকি। এখন তো বেশই হচ্ছে—বিশ্বাস মশায় এ গাঁয়ের মোড়ল। সে যখন ভরসা দিয়েচে, তখন আর ভয় করি নে—

—তা তো বুঝলাম, কিন্তু তোমার যে মন টেকে না কোথাও বেশিদিন।

—হাতে পয়সা এলেই মন টিকবে। তা ছাড়া দিব্যি নদী—

—আমার কিন্তু ইচ্ছে করে একবার ভাতছালা দেখতে।

—তা একবার গেলেই হয়। গরুর গাড়ীতে একদিনের রাস্তা। বিশ্বেস মশায়ের কাছে বললেই গরুর গাড়ী দিতে পারে।

অনঙ্গ আগ্রহের সঙ্গে বললে—হ্যাঁগা তা বলো না। বলবে একবার বিশ্বেস মশায়কে ?

গঙ্গাচরণ হেসে বললে—কেন ? ভাতছালা যাবার খুব ইচ্ছে ?

—খু-উ-ব।

—তুমি তাহোলে পটল আর খোকাকে নিয়ে ঘুরে এসো একদিন।

—কেন তুমি ?

—আমার পাঠশালার ছুটি কই ? আচ্ছা দেখি চেষ্টা করে।

—কতকাল যাই নি ভাতছালা। চার বছর কি পাঁচ বছর। ভাতছালার বিনি নাপিতনীকে মনে আছে ? আহা, কি ভালই বাসতো। আবার দেখা হোলে সেও কত খুশী হয় ! সেই আমবাগানের ধারে আমাদের ঘরখানা।—আচ্ছা কত জায়গায় ঘর বাঁধলে বলো তো ?

গল্পগুজবে শীতের বেলা পড়ে এল। গঙ্গাচরণ উঠে বললে—যাই। একবার পাশের গাঁয়ে যাবো। পাঠশালার জন্যে আরও ছাত্র যোগাড় করে আনি। ছাত্র যত বেশি হবে ততই সুবিধে।

—একটু কিছু জল খেয়ে যাও—

গঙ্গাচরণ আহ্লাদে হেসে বললে—অভ্যেস খারাপ করে দিও না বলচি। এ সময় জলখাবার খেয়েছি কবে ?

অনঙ্গ হাসিমুখে বললে—মা-লক্ষ্মী যখন জুটিয়ে দিয়েচেন, তখন খাও। দাঁড়াও আমি আনি—

একটা পাথরের বাটিতে কয়েক টুকরো পেঁপে কাটা ও আখের টিকলি এবং অন্য একটা কাঁসার বাটিতে খানিকটা সর নিয়ে অনঙ্গ-বৌ স্বামীর সামনে রাখলে। গঙ্গাচরণ খেতে খেতে বললে—আচ্ছা, একটা কাজ করলে হয় না ?

—কি ?

—আচ্ছা, একটু চায়ের ব্যবস্থা করলে হয় না ?

অনঙ্গ ঠোঁট উল্টে বললে—ওঃ ! তোমার যদি হোল তো সব চাই। চা !

—কেন ?

—ওসব বড়মানুষে খায়। গরীবের ঘরে কি পোষায় ?

গঙ্গাচরণ হেসে বললে—আসলে তুমি চা তৈরী করতে জান না তাই বলো !

অনঙ্গ মুখভঙ্গি করে বললে—আহা-হা !

—পারো চা করতে ? কোথায় করলে তুমি ?

অনঙ্গ এক ধরনের হাসলে, যার মানে হচ্ছে, আর ভান করে কি করবো ?

গঙ্গাচরণ বললে—কেমন ধরে ফেলেচি কিনা ?

অনঙ্গ প্রত্যুত্তরে আর একবার হেসে বললে—না করি, করতে দেখেচি তো। বাসুদেব-পুরে চক্কত্তি-বাড়ী চা খেতো সবাই। আমি গিন্নীর কাছে বসে বসে দেখতাম না বুঝি ?

গঙ্গাচরণ পাশের গ্রামে যখন মাঠের পথ দিয়ে বেরিয়ে গেল তখন বেলা বেশ পড়ে এসেচে। সারাদিনের তাজা খর রোদে উলু ও কাশবনে কেমন সুন্দর একটা সোঁদা গন্ধ। শীতও আজ পড়েচে মন্দ নয়।

একটা লোক খেজুর গাছে মাটির ভাঁড় নিয়ে উঠচে দেখে গঙ্গাচরণ ডেকে বললে—বলি ও ছিদাম, একদিন খেজুর-রস খাওয়াও বাবা।

লোকটা গাছের ওপর থেকেই বললে—গুরুমশায় ? কাল সকালে পেটিয়ে দেবেন একটা ছেলে। এক ভাঁড় যেন নিয়ে যায়—

গঙ্গাচরণের মনে যথেষ্ট আনন্দ ও সন্তোষ এই ভেবে যে, কেউ তার কথা এখানে ঠেলতে পারে না। সবাই মানে, যার কাছে যে জিনিস চাওয়া যায়, কেউ দিতে অস্বীকার করে না। বাসুদেবপুরে এমন ছিল না, ভাতছালাতেও না।

পাশের গ্রামের কোনো নাম নেই—'পশ্চিমপাড়া' বলে সবাই। এর একটা কারণ—এসব গ্রাম আজ কয়েক বৎসর হল বসেচে। আগে এসব পতিত মাঠ বা অনাবাদী চর ছিল, এদেশের চাষাদের জমির অভাব ছিল না, তাদের মধ্যে কেউ এসে সব জঙ্গল ও নলখাগড়া ভরা পতিত জমিতে চাষ করতে রাজী নয়। অন্য জেলা থেকে কাপালী জাতীয় চাষীরা এসে এই অনাবাদী চরে সোনা ফলিয়েচে, এরাই নতুন গ্রামগুলো বসিয়েচে—গ্রামের নামকরণ এখনও হয় নি।

পশ্চিমপাড়াতে ঢুকেই গ্রামের মণ্ডপ ঘর। বিকেলে দু-পাঁচজন লোক এখানে বসে তামাক পোড়াচ্চে।

একজন গঙ্গাচরণকে দেখে বললে—কি মনে করে দাদাঠাকুর ? পেরণাম হই। আসুন—

গঙ্গাচরণ ভড়ং দেখাবার জন্যে ফতুয়ার নিচে থেকে পৈতেটা বার করে আঙুলে জড়িয়ে হাত তুলে বললে—জয়স্তু।

তারপর বসে একবার এদিকওদিক তাকিয়ে বললে—এটা বেশ ঘরখানা করেচ তো ? পুজো হয় ?

দলের মধ্যে একজন গঙ্গাচরণকে তামাক খাওয়াবার জন্যে কলাপাত আনতে ছুটলো। একজন বললে—পুজো হয় নি দাদাঠাকুর। সামনের বারে করবার ইচ্ছে আছে—আচ্ছা, আপনি পারবেন দাদাঠাকুর ?

গঙ্গাচরণ অবজ্ঞাসূচক হাসি হেসে চুপ করে রইল, উত্তর দিলে না। ওতে পসার থাকে না।

ওদের মধ্যে আর একজন পূর্বের লোকটিকে ধমক দিয়ে বললে—জানিস নে শুনিস নে কথা বলতে যাস—ওই তো তোর দোষ। উনি জানেন না পুজো কত্তি তো কে করবে ? উনি নেকাপড়া জানা পণ্ডিত মানুষ।

গঙ্গাচরণ ধীর ভাবে বললে—থাক থাক, ও ছেলেমানুষ···বলেচে বলেচে—

ইতিমধ্যে কলার পাত এল, একজন হুঁকো থেকে কল্কে খুলে গঙ্গাচরণের হাতে দিতে যেতেই গঙ্গাচরণ বিস্মিতভাবে বললে—কি ?

—তামাক ইচ্ছে করুন—

—তোমাদের উচ্ছিষ্ট কলকেতে আমি তামাক খাবো ?

দলের যে লোকটি কল্কে এগিয়ে হাতে দিতে গিয়েছিল, সে দস্তুরমত অপ্রতিভ হোল।

তখন ওদের মধ্যে সেই বিজ্ঞ লোকটি আবার ধমক দিয়ে বললে—এ কি পাঁচু-ঠাকুরকে পেয়েছিস তোরা, কাকে কি বলিস তার ঠিক নেই। দাঁড়ান দাদাঠাকুর, আমার বাড়ীতে নতুন কলকে আড়ায় টাঙানো আছে, নিয়ে আসি।

গঙ্গাচরণ গম্ভীরভাবে বললে—হাত ধুয়ে এনো—

উপস্থিত লোকগুলি ভক্তিতে গদগদ হয়ে পড়লো। হাত ধুয়ে নতুন কল্কেতে তামাক সাজতে হয় যার জন্যে, এমন ব্রাহ্মণ সত্যি কথা বলতে গেলে তারা কখনো দেখে নি।

নতুন কল্কে আনীত হোল, নতুন কলাপাতাও। গঙ্গাচরণের হাতে ভক্তিভাবে টাটকা-সাজা তামাক এগিয়ে দেওয়া হোল।

গঙ্গাচরণ বললে—কথাবার্তা বলতে হয় বুঝে-সুজে বাপু। আমি পুজো করতে জানি না-জানি তোমরা যে জিজ্ঞেস করলে—তোমরা এর কিছু বুঝবে ?

বিজ্ঞ লোকটি তাচ্ছিল্যের সুরে বললে—হুঃ, একদম অগ্গ মুখ্যু !

এই কথা বলে নিজের বিজ্ঞতা প্রমাণ করে সে গঙ্গাচরণের দিকে চেয়ে বললে—বাদ দিন ওদের কথা। ওরা কাকে কি বলতে হয় জানে ?

গঙ্গাচরণ বললে—সে কথা যাক গে। এখন তোমাদের এখানে আসার উদ্দেশ্য কি জানো ?

দলের অন্য লোকেরা কথা বলতে সাহস না করতে শুধু বিজ্ঞ লোকটিই এর উত্তরে বললে —কি বলুন দাদাঠাকুর ?

—আমি একটা পাঠশালা খুলেচি নতুন গ্রামে। তোমাদের গ্রামের ছেলেগুলি সেখানে পাঠাতে হবে।

—বেশ কথা দাদাঠাকুর। এ তো খুব ভাল—আমাদের ছেলেপিলেদের একটা হিল্লে হয় তা হলে—

—খুব ভালো। সেজন্য তো আমি এলাম তোমাদের কাছে। তুমি একবার সবাইকে বলো—

লোকটি দলের দিকে চেয়ে বললে—শুনলে তো সবাই দাদাঠাকুর যা বললেন ? আপনি বসুন, আমি ওদের ডেকে নিয়ে একটু পরামর্শ করি—

একটা কাঁটালতলায় সকলে মিলে জোট পাকিয়ে কি বলা-কওয়া করলে, তারপর বিজ্ঞ লোকটি আবার ফিরে এসে গঙ্গাচরণের কাছে বসলো। বললে—সব ঠিক হয়ে গেল দাদাঠাকুর—

—কি ?

—সবাই ছেলে পেটিয়ে দেবে কাল থেকে। ওনারা আর একটা কথা বলচেন—

—কি কথা ?

—আমাদের এখেনে যদি পাঠশালা খোলেন তবে কেমন হয় ?

—দু'জায়গায় হয় না। ও গ্রামে বাস করি, এ গ্রামে পাঠশালা—তাও হয় না।

—কত দিতে হবে আমাদের, একটা ঠিক করে দ্যান্—

—আমার বাপু জোরজবরদস্তি নেই, বিদ্যাদানং মহাপুণ্যং, বিদ্যাদান করলে কোটি অশ্বমেধের ফল লাভ হয়। তবে আমারও তো চলা-চলতির ব্যবস্থা একটা চাই, এই বুঝে তোমরা যা দাও। নিজেরাই ঠিক করো। আমার মুখে বলাটা ভালো হবে না।

গঙ্গাচরণ অভিজ্ঞ ব্যক্তি। এভাবে অগ্রসর হলে ফল ভাল হয় সে জানে। কাজেই বাড়ীতে ফিরে অনঙ্গ যখন বললে—তা ওদের ওপর ফেলে দিলে কেন ? তোমার নিজের বলা উচিত ছিল—তখন গঙ্গাচরণ হেসে বললে—আরে না জেনে কি আর আমি তাড় ঘাঁটতে গিয়েচি। আমি নিজের মুখে হয় তো বলতাম চার আনা—ওরা দেবে আট আনা—দেখে নিও তুমি।

পরদিন সকালে খোদ বিশ্বাস মশাইকে নিজের বাড়ীতে আসতে দেখে গঙ্গাচরণ বিস্মিত হোল। ছেলেকে ডেকে বললে—পটলা, ডেক্সোটা নিয়ে আয় চট করে—

ডেক্সো মানে একটা কেরোসিন কাঠের পুরোনো প্যাক বাক্স। এর নাম 'ডেক্সো' কেন হয়েচে তার ঐতিহাসিকতা নির্ণয় করা দুষ্কর।

বিশ্বাস মশায় বললেন—থাক থাক—আমার জন্যে কেন—

—সে কি হয় ? বসুন বসুন—তারপর কি মনে করে সকালবেলা ?

—একটা কথা ছিল। আমার বাড়ীতে কাল আপনি সমস্কৃতো বলেচেন, বাড়ীর মেয়েরা সব শুনেচে। আমার একটা গাইগরুর আজ মাসাবধি হোল দড়ি গলায় আটকে অপমিত্যু ঘটেচে। সবারই মন সেজন্যে খারাপ। আমার নাতির অসুখ সেই থেকে সারচে না—জ্বর আর সর্দি লেগেই আছে—বুঝলেন ?

গঙ্গাচরণ গম্ভীর ও চিন্তাকুল ভাবে ঘাড় নাড়তে লাগলো। ভাবটা এই রকম যে, "ও তো না হয়েই যায় না"—

বিশ্বাস মশায় বললেন—এখন কি করা যায় ? কাল রাত্তিরে আমার পরিবার বললে—ওনার কাছে যাও, উনি পণ্ডিত লোক, একটা হিল্লে হবে।

গঙ্গাচরণ পূর্ববৎ চিন্তাকুল। সংক্ষেপে শুধু বললে—হুঁ—

ও'র হাবভাব দেখে বিশ্বাস মশায় ভয় পেয়ে গেলেন। খুব গুরুতর কিছু ঘটবার সূত্রপাত নাকি তার সংসারে ? শাস্ত্র জানা ব্রাহ্মণ, কি বুঝেচে কি জানি ? আর কিছু বলতে তাঁর সাহস যোগাল না।

গঙ্গাচরণ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—কিছু খরচ করতে হবে। বিপদে ফেলেচে।

বিশ্বাস মশায় উদ্বেগের সুরে বললেন—কি রকম ? কি রকম ?

—গোবধ মহাপাপ। এত বড় মহাপাপ যে—

বিশ্বাস মশায় বাধা দিয়ে বললেন—কিন্তু এ তো আমরা ইচ্ছে করে করি নি ? মাঠে বাঁধা ছিল, দড়ি গলায় কি করে আটকে—

—ওই একই কথা। গোবধ ওকেই বলে—মহাপাপ।

—এখন কি করা যায় তা হোলে ?

—স্বস্ত্যয়ন করতে হবে, সামনের আমাবস্যের দিন যোগাড় করতে হবে সব। টাকা পনেরো-কুড়ি খরচ হবে।

বিশ্বাস মশায় উদ্বিগ্ন সুরে বললেন—কি কি লাগবে একটা ফর্দ করে দিন না ঠাকুর মশাই।

গঙ্গাচরণ গম্ভীরভাবে বললে—দেখে শুনে ফর্দ করতে হবে। একটা গুরুতর ব্যাপার, আপনার নাতির অসুখ সারা না-সারা এর ওপর নির্ভর করচে। যা-তা করে দিলেই তো হবে না ? দাঁড়ান একটু, আসচি—

গঙ্গাচরণ বাড়ীর মধ্যে ঢুকতেই দেখলে অনঙ্গ-বৌ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ওদের কথাবার্তা সব আড়াল থেকে শুনেচে।

স্বামীকে দেখে বললে—ও কে গা ?—কি হয়েছে ?

গঙ্গাচরণ স্ত্রীকে হাতছানি দিয়ে ভেতরের উঠোনে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল—বড় খদ্দের। উনি হোলেন বিশ্বাস মশায়। তোমার কাপড় আছে ক'খানা ?

—আমার ?

—আঃ, তাড়াতাড়ি বল না ? তোমার না তো কি আমার।

—আমার আটপৌরে শাড়ী আছে দু'খানা, আর একখানা, তিনখানা। তোরঙ্গের মধ্যে তোলা ভালো শাড়ী আছে দু'খানা।

—কি নেবে বলো। ভালো শাড়ী না আটপৌরে ?

—ভালো শাড়ী একখানা হোলে বড্ড ভালো হয়, কস্তাপেড়ে, এই—এই রকম জলচুড়ি দেওয়া, বাসুদেবপুরে চক্কত্তি-গিন্নীর পরনে দেখে সেই পর্যন্ত বড্ড মনটার ইচ্ছে—হ্যাঁ গা, কে দেবে গা ?

—আঃ, একটু আস্তে কথা বলতে পারো না ছাই ? দাঁড়িয়ে রয়েচে বাইরে। আর শোনো, গাওয়া ঘি আছে ঘরে ?

অনঙ্গ ঠোঁট উল্টে তাচ্ছিল্যের সুরে বললে—গাওয়া ঘি ? বলে ভাত পায় না, মুড়কি জলপান—

গঙ্গাচরণ বাইরে এসে বললে—এই যে বিশ্বাস মশায়, বসিয়ে রাখলাম। কিন্তু এসব কাজ ভেবে চিন্তে করে দিতে হয়। শুনে নিন—ভালো লালপাড় শাড়ী একখানা, গাওয়া ঘি আধ সের—ওটা—তিন পোয়াই ধরুন। চিনি পাঁচপোয়া, পাকাকলা একছড়া, সন্দেশ পাঁচপোয়া, গামছা দুখানা, পেতলের থালা একখানা, ঘটি একটা, ধুনো একপোয়া···ওঃ ভুলে গিয়েচি, মধুপর্কের বাটি একটা, আসন একটা—

বিশ্বাস মশায় মন দিয়ে ফর্দ শুনে বললেন—আর সব নতুন দেবো, কিন্তু ও থালাঘটি কি নতুনই দিতে হবে ? আপনার বাড়ী থেকে না হয় দিন, কিছু দাম ধরে দিলে হয় না ?

—তা হয়। তবে খুঁৎ না রাখাই ভালো। আপনি নতুনই দেবেন।

—দিন ঠিক করে দিন—

—সামনের আমাবস্যায় হবে, ও আর দিন ঠিক কি। বলেছি তো। দক্ষিণে লাগবে ২ টাকা।

বিশ্বাস মশায় অনুরোধের সুরে বললেন—টাকা খরচের জন্যে আপত্তি নেই—যাতে নাতিটি আমার—ঠাকুর মশাই—যাতে সেরে ওঠে—

প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে উঠলেন উনি।

গঙ্গাচরণ আশ্বাসের ভঙ্গিতে বললে—হুঃ, গোবধ! বলে কত কত শক্ত কান্ডের জন্যে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করে এলাম! কোনো ভয় নেই, যান আপনি।

অনঙ্গ স্বামীর কৃতিত্বে খুশি না হয়ে পারলো না যেদিন গঙ্গাচরণ বিশ্বাস মশায়ের বাড়ী থেকে একরাশি জিনিসপত্র বহন করে বাড়ী নিয়ে এল। একগাল হেসে বললে—দেখি শাড়ীখানা? বাঃ, চমৎকার কস্তাপেড়ে—গাওয়া ঘি? কতটা?

—তা আছে পাকি তিনপোয়া। বাড়ীর তৈরী খাঁটি ঘি।

—এইবার একবার ভাতছালা বেড়িয়ে আসি, কি বলো?

—বিশ্বেস মশায়কে বলেও এসেছি। গরুর গাড়ী দেবে বলেচে—

—তুমি যাবে না?

—আমার কি সময় আছে যে যাবো? ছেলে পড়াতে হবে না? তুমি যাও ছেলেদের নিয়ে। এসময়ে টাকাও পেয়েচি দুটো। একটা থাক্, একটা খরচ করে এসো।

কিন্তু যাই যাই করে শীত কেটে গিয়ে ফাল্গুন মাস পড়ে গেল। তখন অনঙ্গ একদিন বিশ্বাস মশায়ের গরুর গাড়ীতে ছেলেদের নিয়ে ভাতছালা রওনা হোল। দু'ক্রোশ পথ গিয়ে কাটালিয়া নদী পার হতে হোল জোড়াখেয়া নৌকোতে গরুর গাড়ীসুদ্ধ। অনঙ্গ-বৌয়ের বেশ মজা লাগলো এমনভাবে নদী পার হতে। ওপারে উঁচু ডাঙায় নদীতীরে প্রথম বসন্তে বিস্তর ঘেঁটুফুল ফুটে আছে, বাতাসে ভুর ভুর করচে আমের বউলের মিষ্ট সুবাস, আঁকাবাঁকা শিমুলগাছে রাঙাফুল ফুটে আছে।

অনঙ্গ ছেলেদের বললে—এখানে এই ছায়ায় বসে দুটো মুড়ি খেয়ে নে—কখন ভাতছালা পেঁছিবি তার ঠিক নেই।

বড়ছেলেটা বললে—ওঃ, কি আমের বোল হয়েচে দ্যাখো সব গাছে। এবার বড্ড আম হবে, না মা?

—খেয়ে নে মুড়ি। আমের বোল দেখবার সময় নেই এখন।

ছেলে দুটি ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগলো নদীর পাড়ে গাছপালার ছায়ায় ফড়িং ধরবার জন্যে। অনঙ্গ ওদের বকেঝকে আবার গাড়ীতে ওঠালে।

নিস্তব্ধ ফাল্গুন-দুপুরে মেঠোপথে আমবন, জাম, বট, বাঁশ, শিমুলগাছের ছায়ায় ছায়ায় গরুর গাড়ীর ছইয়ের মধ্যে বসে অনঙ্গ-বৌয়ের ঝিমুনি ধরলো। বড়ছেলে বললে—মা, তুমি ঢুলে পড়ে যাচ্চ যে, উঠে বোসো।

অনঙ্গ অপ্রতিভ হয়ে বললে—চোখে একটু জল দিলে হোত। ঘুম আসচে।

ভাতছালা পেঁছুতে বেলা পড়ে গেল। গাড়োয়ান বললে—তবু সকালে সকালে এসে গ্যালাম মা-ঠাকরোণ। ন'কোশ রাস্তা আমাদের গাঁ থে। গরু দুটোর সুধার বয়েস তাই আসতে পারলে।

ভাতছালাতে অনঙ্গ-বৌয়ের ঘর ছিল গ্রামের বাগ্দি পাড়া থেকে অল্পদূরে খুব বড় একটা বিলের কাছে। একখানা খড়ের ঘর, সঙ্গে ছোট একখানা রান্নাঘর, অনেকদিন কেউ না থাকাতে চালার খড় কিছু কিছু উড়ে পড়েচে, মাটির দাওয়াতে ছাগল গরু উঠে খুঁড়ে ফেলেচে। উঠোনের চারিধারে বাঁশের বেড়া দেওয়া ছিল, ফাঁকে ফাঁকে রাংচিতার গাছ। বেড়ার শুকনো বাঁশ লোকে ভেঙে নিয়েচে অনেক।

মতি বাগ্‌দিনী ছুটে এল ওদের গরুর গাড়ী দেখে। মহাখুশির সঙ্গে বললে—বামুন-দিদি আলেন নাকি? ওমা, আমাদের কি ভাগ্যি—

অনঙ্গ-বৌ বললে—আয় আয় ও মতি, ভাল আছিস?

—দাঁড়ান, আগে একটু গড় করে নিই। পায়ের ধুলো দ্যান এট্টু—খোকারা বেশ বড় হয়েচে দেখচি। বাঃ—

—ভাল ছিলি?

—আপনাদের ছিচরণের আশীব্বাদে। এখন আছেন কোথায়?

—ওই নতুনগাঁ, কাপালীপাড়ায়। ন'কোশ রাস্তা এখান থেকে।

—এখানে এখন থাকবেন তো?

—বেশিদিন কি থাকতে পারি? সেখানে উনি ইস্কুল খুলেচেন মস্তবড়। এক-ঘর ছাত্তর। দুদিন থাকবো তাই তাঁকে রেঁধে খেতে হবে।

—খাওয়াদাওয়ার যোগাড় করবো?

—আমাদের সঙ্গে চালডাল আছে পুঁটুলিতে। তুই দুটো শুকনো কাঠ কুড়িয়ে দিয়ে যা।

পদ্মবিলের থেকে কিছু দূরে মুচিপাড়া। প্রায় একশো ঘর মুচির বাস। পদ্মবিলে মাছ ধরে আশপাশের গ্রামে বেচে এরা জীবিকা-নির্বাহ করে। পোয়াটাক পথ দূরে গ্রামের অন্য অন্য জাত বাস করে। ব্রাহ্মণের বাস এ গ্রামেও নেই—এর একটা প্রধান কারণ, গঙ্গাচরণ এমন গ্রামে বাস করে নি যেখানে ব্রাহ্মণের বাস আছে। কারণ সে গ্রামে তার পসার থাকবে না। তার বদলে অন্য ব্রাহ্মণ যেখানে ডাকবার সুবিধে আছে, এমন গ্রামে সে ঘর বাঁধতে যাবে কি জন্যে? তাতে আদর হয় না।

অনঙ্গ-বৌয়ের আগমনের সংবাদে গোয়ালাপাড়া থেকে বৌ-ঝিয়েরা দেখা করতে এল। কেউ নিয়ে এল একটি ঘটিতে সেরখানেক দুধ, কেউ নিয়ে এল খানিকটা খেজুর-গুড়ের পাটালি, কেউ একছড়া পাকা মর্তমান কলা। অনেক রাত পর্যন্ত ঝি-বৌয়েরা দাওয়ায় বসে গল্প করলে। সকলেই মহাখুশি অনঙ্গ-বৌ আসাতে। সকলেই অনুরোধ জানালে এখানে কিছুদিন থাকতে। এখানে আবার উঠে এলে কেমন হয়? তারা সব সুবিধে করে দেবে বসবাসের। কোনো অভাব-অভিযোগ থাকতে দেবে না। আসুন না বামুনদিদি তাঁদের গাঁয়ে আবার?

ওরা নিজেরাই ঘরদোর ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করে দিলে। মাটির প্রদীপে তেল সলতে দিয়ে আলো জেলে দিলে।

মতি মুচিনী বললে—রাত্তিরে আমি এসে শোবো ঘরের দাওয়ায়। দুটো খেয়ে আসি—

অনঙ্গ-বৌ তাকে বাড়ী গিয়ে খেতে দিলে না। যা রান্না হয়, এখানেই দুটো ডাল ভাত খেয়ে নিলেই হবে। গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানও তো খাবে।

সন্ধ্যার পরে বেশ জ্যোৎস্না উঠলো। একটু ঠাণ্ডা পড়েচে জোর দক্ষিণ বাতাসে। বৌ-ঝিয়েরা একে একে চলে গেল। মতি মুচিনী কলার পাত কেটে এনে বিলের ধারে ঘাসের উপর ভাত খেতে বসলো। গাড়োয়ান বললে তার শরীর খারাপ হয়েচে, সে কিছু খাবে না রাত্রে।

অনঙ্গ মাদুর পেতে গল্প করতে বসলো বিলের দিকের জ্যোৎস্নালোকিত দাওয়ায়। শ্যামাচরণ ঘোষের বিধবা মেয়ে একটা কেরোসিনের টেমি ধরিয়ে এসে হাজির হোল অনেক রাত্রে। সেও রাত্রে এখানে শোবে। অনঙ্গ-বৌকে সেও বড় ভালবাসে। এ মেয়েটির,

বিবাহ হয়েছিল পাশের গ্রাম কুমুরে। এগারো বছর বয়সে বিধবা হয়েচে, এখন প্রায় সাতাশ আটাশ বছর বয়েস, দেখতে এখনও সুন্দরী, টকটকে ফর্সা রং, মুখশ্রীও ভাল।

অনঙ্গ হেসে বললে—আয় কালী, চাঁদনি রাতে আবার একটা টেমি কেন?

কালী আঁচল দিয়ে টেমিটা বাঁচিয়ে আনচে পদ্মবিলের জোর দক্ষিণে হাওয়া থেকে বললে—সে জন্যে নয় দিদি, ওই মুচিপাড়ার বাঁশবাগান দিয়ে আসতে গা ছমছম করে এং রাত্তিরে।

—কেন রে? ভূতে তোর ঘাড় মটকাবে?

কালী হেসে বললে—ওসব নাম কোরো না রাত্তির বেলা। তুমি ডাকাত মেয়েমানুষ বাবা—

—দূরে পোড়ারমুখী, ব্রাহ্মণের আবার ভয় কি রে?

—ভুতে বামুন-বোষ্টম মানে না বৌদি, সত্যি কথা বলচি। সেবার হোল কি—

মতি মুচিনী ভয় পেয়ে বললে—বাদ দেও, ওসব গল্প এখন করে না। এই খেজুরে চটখানা পেতে শুয়ে পড় বামুন-দিদির পাশে।

অনঙ্গ-বৌয়ের মনে আজ খুব আনন্দ। অনেকদিন পরে সে তার পুরোনো ঘরে ফিরে এসেচে। আবার পুরোনো সঙ্গিনীদের সঙ্গে দেখা হয়েচে। পদ্মবিলের ওপর এমন জ্যোৎস্নারাত্রি কতকাল সে দেখে নি। অথচ এখানে যখন ছিল, তখন কোনদিন খাওয় জুটতো, কোনোদিন জুটতো না। এই মতি মুচিনী কত পাকা আম কুড়িয়ে এনে দিয়েচে লোকের গাছের পাকা কাঁটাল চুরি করে পর্যন্ত এনে খাইয়েচে। এই কালী গোয়ালিনী বাড়ী থেকে ভাইবৌকে লুকিয়ে নতুন ধানের চিঁড়ে এনে দিয়েচে।

অনঙ্গ-বৌ বিলের জলের দিকে চেয়ে অন্যমনস্কভাবে বললে—মনে আছে কালী, সেই একদিন লক্ষ্মীপুজোর রাতের কথা?

কালী মৃদু হেসে চুপ করে রইল। বামুনের মেয়েকে খাবার যোগাড় ক'রে দিয়েচে একদিন, তা কি সে এখন মুখে বলবে?

—মনে নেই?

—ও কথা ছেড়ে দাও বৌদিদি।

—তুই সেদিন চিঁড়ে না আনলে উপোস দিতে হোত।

—আবার ও কথা? ছিঃ—

অনঙ্গ আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—ওই পদ্মবিলের ওখানটাতে একটা শোল মাছ ধরেছিলাম, মনে আছে মতি?

মতি বললে—গামছা দিয়ে। ওমা, সেদিনের কথা যে! খুব মনে আছে। তুমি আর আমি নাইতি গিয়েছিলাম—

—মস্ত বড় মাছটা ছিল। না রে?

—ভাল কথা মনে হোল। কাল মনে করে দিয়ো দিকিনি। দেওর মাছ ধরবে কাল একটা বাণ মাছ কাল খাওয়াবো বামুনদিদিকে। বড্ডো সোয়াদ বিলির মাছের—

—সে যেন তুই আমায় নতুন শেখাচ্ছিস মতি!

কালী বলে উঠলো—ওই শোনো মতির কথা! মুচি তা আর কত বুদ্ধি হবে? বৌদি যেন আর এ গাঁয়ের মানুষ না? দুদিনের জন্য চলে গিয়েচে, তাই কি? আবার ফিরে আসবে না বৌদি?

—কেন আসবো না ? আমার সাধ ছিল পদ্মবিলের একেবারে ধারে একখানা ঘর
:বো।

—তোমার এ ঘরও তো বিলের ধারে বৌদি ? কত দূরে আর ? ওই তো কাছেই।

—তা না রে, বিলের একেবারে ধারে ওই যে বাঁশঝাড়টা ওরই পাশে ঘর বাঁধবার ইচ্ছে
।। বেশ ভালো হোত না ?

—এখন বাঁধো। আমি বাঁশ, খড় সব জুটিয়ে দেবো বাবাকে বলে।

অনঙ্গ-বৌয়ের ঘুম এল না অনেক রাত পর্যন্ত।

সে ভাবছিল তার জীবনের গত দিনগুলির কথা। ছুতোরখালি গ্রামে তার বাপের
ী। বাবা ছিলেন সামান্য অবস্থার গৃহস্থ, জমিজমার সামান্য আয়ে সংসার চালাতেন।
হরপুরে কি একটা কাজে গিয়ে গঙ্গাচরণের বাবার সঙ্গে আলাপ হয়—সেই সূত্রে মেয়ের
র সম্বন্ধ করেন গঙ্গাচরণের সঙ্গে। কিন্তু বিবাহের কিছুদিন পূর্বেই হঠাৎ তিনি মারা
। মামাদের চেষ্টায় ও গঙ্গাচরণের বাবার দয়ায় হরিহরপুরেই বিবাহ হয়। একখানা
লালপাড় শাড়ী ও মায়ের হাতের সোনা-বাঁধানো শাঁখা—এর বেশি কিছু জোটে নি
ঙ্গ-বৌয়ের ভাগ্যে বিয়ের সময়ে।

এদিকে বিয়ের কিছুদিন পরে গঙ্গাচরণের বাবাও মারা গেলেন। গঙ্গাচরণের জ্ঞাতিরা
রকম শত্রুতা করতে লাগলো। হরিহরপুরে একখানা পুরোনো কোঠাবাড়ী ও একটা
বাগান ছাড়া অন্য কিছু আয়কর সম্পত্তি ছিল না, জ্ঞাতিদের শত্রুতায় অবস্থা শেষে এমন
লো যে আমবাগানের একটি আমও ঘরে আসে না। কোনো আয় ছিল না সংসারের,
নের মানকচু তুলে কামারগাঁতির হাটে নিজের মাথায় করে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে
চরণকে চাল কিনে আনতে হয়েচে, তবে স্বামী-স্ত্রীর সংসার চলেচে।

একদিন খুব বর্ষার দিন। ফুটো ছাদ দিয়ে জল পড়ে ঘর ভেসে যাচ্চে, অনঙ্গ-বৌ
ীকে বললে— হ্যাঁগা, বাড়ীঘর না সারালে এখানে তো আর থাকা যায় না ?

গঙ্গাচরণ বললে—কি করি বৌ, বসন্ত মিস্ত্রিকে জিজ্ঞেস করি নি ভাবচো ! আমি বসে
। দুশোটি টাকার এক পয়সার কমে ও ছাদ উঠবে না।

—কোথায় পাবে দুশো টাকা ? দু'টাকার সম্বল আছে তোমার ? আমার পরামর্শ
না, এ-দেশ ছেড়ে অন্য জায়গায় যাই।

—কোথায় যাই বলো দেশ ছেড়ে, কে জায়গা দেবে ?

—সে কথা আমি জানি ? পুরুষমানুষ—সে তুমি বোঝো। আর জ্ঞাতি-শত্রুরের সঙ্গে
 করে এখানে টিঁকে থাকতে পারবে না তুমি।

সেই হোল ওদের দেশত্যাগের সূত্রপাত। তারপর আশ্বিন মাসে পুজোর পরই
প্রথমে এল এই ভাতছালা। এখানে প্রথম প্রথম ভালই চলেছিল, পরে একটু অসুবিধে
গেল। তার প্রধান কারণ, ভাতছালায় এরা এসেছিল স্থানীয় গোয়ালারা ধানের জমি করে
আশা দিয়েছিল বলে। কিন্তু দু'বছর হয়ে গেল, ধানের জমির কোনো বন্দোবস্তই আর
উঠলো না। এক বেলা খাওয়া হয় ওদের তো অন্য বেলা হয় না। সেই সময় এই
গোয়ালিনী যথেষ্ট সাহায্য করেছিল ওদের। বিরক্ত হয়ে ওরা এখান থেকে উঠে যায়
দেবপুরে। সেখানে অন্য সুবিধে মন্দ ছিল না, কিন্তু ম্যালেরিয়াতে অনঙ্গ-বৌ মরে

যাওয়ার যোগাড় হোল। তখন নতুন গাঁয়ের কাপালীদের সংগে বাসুদেবপুরের হা আলাপ হয় গংগাচরণের, কাপালীরা পাঠশালার মাস্টার চাইচে শুনে গংগাচরণ যেতে রা হয়। ওরাও খুব আগ্রহ করে নিয়ে যেতে চায়। সেই থেকেই নতুন গাঁয়ে বাস।

অনংগ বলে—কালী ঘুমুলে নাকি? বাবাঃ কি ঘুম তোদের?

মতি ঘুমজড়িত স্বরে বলে—বামুন-দিদি, ঘুমোও নি এখনো? রাত যে পুইয়ে এ ঘুমিয়ে পড়ো। পুবে ফর্সা হোল—

—তোর মুণ্ডু হোল পোড়ারমুখী—

অনংগ-বৌ ভাবছিল তার জীবনে কত জায়গায় যাওয়া হোল, কত কি দেখা হোল! বয়সী ক'টা মেয়ে এমন নানা জায়গায় বেড়িয়েচে? ওই তো তারই সমবয়সী হেম র হরিহরপুরে, তার শ্বশুরবাড়ীর গ্রামে। কোথাও যায় নি, কোনো দেশ দেখে নি।

সে ভাবলে—ভালো কাপড় পরতে পারি নি, খেতে পাই নি তাই কি? আমার এত জায়গা বেড়িয়েচে হেম? কত জায়গা। ধর হরিহরপুর, সেখান থেকে ভাতছা ভাতছালা থেকে বাসুদেবপুর—তার পর এখন নতুনগাঁ। উঃ—কথাটা কালীকে বল জন্যে সে ব্যাকুল হয়ে উঠলো। ডাক দিলে—ও কালী, কালী, একটা কথা শোন্ না?

মতি ঘুমজড়িত স্বরে বললে—বামুন-দিদি, তুমি জ্বালালে দেখচি, ঘুমুতি দেবা রাত্তিরে? কালী ঘুমিয়ে গিয়েচে অনেকক্ষণ, ওকে আর ডাকাডাকি কোরো না। পুইয়ে গেল যে।

অনংগ-বৌ হেসে তার গায়ে একটা কাটি ছুঁড়ে মেরে বললে—দূর পোড়ারমুখী—

যে দু'দিন অনংগ এখানে রইল, এমন নিছক আনন্দের দুটি দিন ওর জীবনে কত আসে নি। চলে আসবার দিন মতি মুচিনী কেঁদে আকুল হোল। সে এ গাঁয়ে থাকতে চায় না, অনংগ-বৌয়ের সংগে চলে যাবে। কালী গোয়ালিনী আধ সের ভাল গা ঘি ও দুটো মানকচু নিয়ে এসে দিলে। মতি খেজুর গুড়ের পাটালি নিয়ে এলো খে গাছের বাকলায় বেঁধে।

গংগাচরণ জিনিসপত্র দেখে বললে—বাঃ অনেক সওদা করে এনেছ দেখচি—

অনংগ হাসি হাসি মুখে বললে—দাম দিতে হবে আমাকে কিন্তু।

—ভাল কথাই তো। কেমন দেখলে?

—অতি চমৎকার। আমার যে কি ভাল লেগেচে! মতি এল, কালী এল, গাঁয়ের ঝি-বৌ দেখতে এল—

—ওরা এখনো ভোলে নি আমাদের?

—ভুলে যাবে? সবাই বলে এখানে এসে আবার বাস করুন বামুন-দিদি। হা পদ্মবিলের ধারে একখানা ঘর বাঁধো না কেন? আমার বড্ড সাধ কিন্তু।

—আবার ভাতছালা ফিরে যাবে? সে হয় না। পাঠশালা জমে উঠেচে। এখন নড়া যায়, গেলেই লোকসান।

—তুমি যা ভালো বোঝো। আমার কিন্তু বাপু ওখানে একখানা ঘর বাঁধবার ইচ্ছে।

গঙ্গাচরণ সেদিন পাঠশালা জমিয়ে বসেচে, সামনের পথ দিয়ে একজন পথ-চলতি লোক ত যেতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পাঠশালার মধ্যে ঢুকে বললে—এটা পাঠশালা ?

—হ্যাঁ।

—মশাই দেখচি ব্রাহ্মণ, একটু তামাক খাওয়াতে পারেন ? আমিও ব্রাহ্মণ। নমস্কার।

—বসুন বসুন, নমস্কার—ওরে—

গঙ্গাচরণের ইঙ্গিতে একজন ছাত্র তামাক সাজতে ছুটলো।

আগন্তুক লোকটির পায়ে পুরোনো ও তালি দেওয়া ক্যাম্বিসের জুতো, গায়ে মলিন রান, হাতে একগাছি তৈলপক্ব সরু বাঁশের ছড়ি। পায়ে জুতো থাকা সত্ত্বেও সাদা ধুলো পর্যন্ত উঠেচে। লোকটি একটা কেরোসিন কাঠের বাক্সের ওপর ক্লান্তভাবে বসে পড়লো।

গঙ্গাচরণ বললে—মশায়ের নাম ?

—আজ্ঞে দুর্গা বাঁড়ুয্যে। নিবাস, কুমুরে নাগরখালি, আড়ংঘাটার সন্নিকট। আমিও পনার মত ইস্কুল মাস্টার।—অম্বিকপুর চেনেন ? এখান থেকে পাঁচ কোশ পথ। ম্বকপুরে লোয়ার প্রাইমারী ইস্কুলে সেকেন্ পণ্ডিত।

—বেশ, বেশ। তামাক ইচ্ছে করুন—

—আগে আমায় একটু জল খাওয়াতে পারেন ?

—ডাব খাবেন ? ওরে পাঁচু, যাও বাবা, হরি কাপালীর চারাগাছ থেকে আমার নাম করে টা ডাব চট্ করে পেড়ে নিয়ে এসো তো ?

আগন্তুক লোকটি প্রশংসমান দৃষ্টিতে গঙ্গাচরণের দিকে চেয়ে বললে—বাঃ, আপনার াচ এখানে বেশ পসার।

গঙ্গাচরণ মৃদু হেসে চুপ করে রইল। বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজের পসার-প্রতিপত্তির কথা জের মুখে বলে না।

ইতিমধ্যে ডাব এসে পড়লো। ডাবের জল খেয়ে দুর্গাপদ বাঁড়ুয্যে আরামে নিঃশ্বাস ফেলে কা হাতে নিয়ে সজোরে ধূমপান করতে লাগলো। আপন মনেই বললে—বেশ আছেন পনি—বেশ আছেন—

গঙ্গাচরণ বিনীতভাবে বললে—আপনাদের বাপ-মায়ের আশীর্বাদে এক রকম চলে যাচ্চে—

—না, না, বেশ আছেন। দেখে আনন্দ হয়, আমার মতই ইস্কুল মাস্টার একজন, ভাল ব থাকতে দেখলেই আনন্দ হয়।

—আপনি ওখানে কি রকম পান ?

—মাইনে পাই তিন টাকা ইস্কুল থেকে। গভর্ণমেন্টের এড্ পাই দেড় টাকা। নিয়ন বোর্ডের এড্ পাই ন'-সিকে মাসে। এই ধরুন সর্বসাকুল্যে পৌনে সাত টাকা। এক রকম চলে যায়—

গঙ্গাচরণ বললে—মাসে মাসে পান তো ?

দুর্গাপদ বাঁড়ুয্যে গর্বের সুরে বললে—নিশ্চয়ই, এ হোল গভর্ণমেন্টের কারবার। এতে নো গোলমাল হবার জোটি নেই। তবে মোটে সাত টাকায় সংসার ভাল চলে না।

—মশায়ের ছেলেপিলে কি ?

—একটি মাত্র মেয়ে, আর আমার পরিবার। তবে আমার বিধবা ভগ্নী আমার সংসারেই ক। সাত টাকায় এতগুলি লোকের—

—আর কিছু আয় নেই ?

—আজ্ঞে না। আমি বিদেশী লোক, ওখানে আর কি আয় থাকবে ?

—ও গ্রামে কি ব্রাহ্মণের বাস বেশি ? নাকি অন্য অন্য জাতও আছে ? আপনি সঙ্গে দশকর্ম ধরুন না কেন ? এই ধরুন লক্ষ্মীপুজো মনসাপুজো, ষষ্ঠীপুজোটুজো—

—ও-সব চলবে না। সেখানে পুরুত আছে গ্রামে। ব্রাহ্মণের গ্রাম—

—ওখানেই আপনি ভুল করেচেন—এই ! গোলমাল করবি তো একেবারে পিঠের তুলবো সব। ব্রাহ্মণের গ্রামে বসতে নেই কক্ষনো। ওতে পসার হয় না মশাই—

—কথাটা ঠিকই বলেচেন। আপনি বেশ আছেন, ডাব আনতে বললেন অমনি এসে হাজির। অমন না হোলে বাসের সুখ। আমার আর কোনো আয় নেই ওই সাত টাকা ছাড়া। তবে ধরুন কলাটা, বেগুনটা মধ্যে মধ্যে ছাত্রেরা আনে।

দুর্গাপদ বাঁড়ুয্যে কথাবার্তার ফাঁকে অন্যমনস্ক হয়ে কি ভাবতে লাগলো। পু তামাক সেজে যখন হুঁকো তার হাতে দেওয়া হোল, তখন বললে—একটা কথা ভাবচি—

—কি বলুন ?

—দু'জনে মিলে একটা আপার প্রাইমারি ইস্কুল গড়ে তুলি না কেন ? আপি গুরুট্রেনিং পাস ?

—না।

দুর্গাপদ চিন্তাকুল ভাবে বললে—তাই তো। গুরুট্রেনিং পাস না থাকলে হেড ম হতে পারবেন না যে ! বাইরে থেকে আবার কাউকে আনলে তাকে ভাগ দিতে হবে কি সে নিজের কোলে সব ঝোল টেনে নেবে। তাতে সুবিধে হবে না—আমার ওখানে ভাল লাগচে না। সঙ্গী নেই, দুটো কথা কইবার মানুষ নেই—ব্রাহ্মণ যা আছে, সব অশি চাষবাসই নিয়ে আছে। সংসার অনিত্য, আমি মশাই আবার একটু ধম্মকথা, একটু আলোচনা বড্ড পছন্দ করি।

গঙ্গাচরণ মনে মনে বললে—এই রে, খেয়েচে ! মুখে বললে—সে তো খুব ভালো ব

—আপনি আর আমি সমব্যবসায়ী। তাই আপনার কাছে এত কথা খুলে বল কিছু মনে করবেন না যেন ! আচ্ছা আজ উঠি। অনেকদূরে যেতে হবে।

—আবার যখন এদিকে আসবেন, দেখা দেবেন দয়া করে।

—সে আর বলতে মশাই ? একদিন আমার পরিবারকে নিয়ে এসে আপনাদের বাড় আলাপ করিয়ে দেবো। আচ্ছা আসি, নমস্কার—

গ্রামের বিশ্বাস মশায়ের নাতিটি কাকতালীয় ভাবে সুস্থ হয়ে উঠলো গঙ্গাচরণের শ স্বস্ত্যয়নের পরে। এতে গঙ্গাচরণের পসার আরো বেড়ে গেল গ্রামের লোকেদের কা একদিন একজন লোক এসে গঙ্গাচরণকে বললে—আমাদের গাঁয়ে একবার যেতে হচ্ছে পা মশায়—

—এসো, বসো। কোথায় বাড়ী ?

—কামদেবপুর, এখান থেকে তিন ক্রোশ। আপনার নাম শুনে আসচি। সবাই ব পণ্ডিত মশায় গুণী লোক। আমাদের গাঁয়ের আশেপাশে বড় ওলাউঠোর ব্যায়রাম চল আপনাকে যেয়ে আমাদের গাঁ বন্ধ করতে হবে।

গঙ্গাচরণ 'গাঁ বন্ধ করা' কথাটা প্রথম শুনলো। তবুও আন্দাজ করে নিল লোকটা কি চাইচে। তাদের গ্রামে যাতে ওলাউঠার অসুখ না ঢোকে, এজন্যে মন্ত্র পড়ে গ্রামের চারিদিক গণ্ডি টেনে দিয়ে মহামারীর আগমন বন্ধ করতে হবে, এই ব্যাপার।

কাঁচা লোকের মতো গঙ্গাচরণ তখনই বলে উঠলো না, 'হ্যাঁ, এখুনি করে দেবো, তাতে আর কি' ইত্যাদি। সে গম্ভীর ভাবে তামাক টেনে যেতে লাগলো, উত্তরে 'হ্যাঁ' কি 'না' কিছুই বললে না।

লোকটি উদ্বিগ্নস্বরে বললে—ঠাকুর মশায়, হবে তো আমাদের ওপর দয়া ?

গঙ্গাচরণ স্থির ভাবে বললে—তাই ভাবচি।

—কেন পণ্ডিতমশায় ? এ আপনাকে হাতে নিতেই হবে—

—বড্ড শক্ত কাজ। বড্ড শক্ত—

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপ। পরে লোকটা পুনরায় আকুল ভাবে বললে—তবে কি হবে না ?

গঙ্গাচরণ নীরব। দু'মিনিট।

—পণ্ডিত মশায় ?

—বাপু হে, অমন বকবক কোরো না। মাথা ধরিয়ে দিলে যে বকে। দাঁড়াও, ভাবতে দাও—

লোকটা ধমক খেয়ে চুপ করে রইল, যদিও সে বুঝতে পারল না এতক্ষণ সে অমন কি বকছিল, যাতে পণ্ডিত মশায়ের মাথা ধরতে পারে। নিজে থেকে সে কোনো কথা বলতে আর সাহস করলে না। গঙ্গাচরণ নিজেই খানিকটা চিন্তার পর বললে—কুলকুণ্ডলিনী জাগরণ করতে হবে, বড্ড শক্ত কথা। পয়সা খরচ করতে হবে। পারবে ?

লোকটা এবার উৎসাহ পেয়ে বললে—আপনি যা বলেন পণ্ডিতমশাই। আমাদের গাঁয়ে আমরা ষাট-সত্তর ঘর বাস করি। হিঁদু-মোছলমানে মিলে চাঁদা তুলে খরচ যোগাবো। প্রাণ নিয়ে কথা, আশপাশের গাঁ মরে উজোড় হয়ে যাচ্চে, যদি পয়সা খরচ কল্লি আমাদের প্রাণগুলো বাঁচে—

—নদীর জল খাও ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমাদের গাঁয়ের নিচেই বাঁওড়—বাঁওড়ের জল খাই।

—গাঁ বন্ধ করলে বাঁওড়ের জল আর খেতে পাবে না কেউ। পাতকুয়োর জল খেতে হবে।

—সে আপনি যেমন আজ্ঞে করবেন—কত খরচ হবে বলুন।

গঙ্গাচরণ মনে মনে হিসেব করবার ভঙ্গি করে কিছুক্ষণ পরে বললে—সর্বসাকুল্যে প্রায় ত্রিশ টাকা খরচ হবে—ফর্দ করে দিচ্চি নিয়ে যাও।

লোকটা যেন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো। এত গম্ভীর ভূমিকার পর মাত্র ত্রিশটি টাকা খরচের প্রস্তাব সে আশা করে নি। কিন্তু গঙ্গাচরণের উচ্চাশা সীমা পেঁছে গিয়েচে, ভাতছালাতেও যাকে স্ত্রীপুত্রসহ অনেক সময় দিনে রাতে একবার মাত্র অন্নাহার করে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েচে, সে এর বেশী চাইতে পারে কি করে ?

গঙ্গাচরণ বাড়ীর মধ্যে ঢুকে স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করলে। সংসারের কি কি দরকার ? অনঙ্গ-বৌ বেশি আদায় করতে জানে না। স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শ করে একটা ফর্দ খাড়া করলে, তেমন ব্যয়সাধ্য ফর্দ নয়।

অনঙ্গ-বৌ বললে—তুমি গাঁ বন্ধ করতে পারবে তো ? এতগুলো লোকের প্রাণ নিয়ে খেলা—

গঙ্গাচরণ হেসে বললে—আমি পাঠশালায় ছেলেদের 'স্বাস্থ্য প্রবেশিকা' বই পড়াই। তাতে লেখা আছে মহামারীর সময় কি কি করা উচিত অনুচিত। আসলে তাতেই গাঁ বন্ধ হবে। মন্ত্র পড়ে গাঁ বন্ধ করতে হবে না।

বাইরে এসে বললে—ফর্দ লিখে নাও—আলোচাল দশ সের, পাকা কলা দশ ছড়া, গাওয়া ঘি আড়াই সের, সন্দেশ আড়াই সের—কাপড় চাই তিনখানা শাড়ী, কস্তাপেড়ে, তিন ভেরবীর, আর প্রমাণ ধুতিচাদর ভৈরবের—আরও ধরো—হোমের তাম্রকুণ্ডু।

লোকটা ফর্দ নিয়ে চলে গেল।

কামদেবপুর গ্রামে যেদিন গঙ্গাচরণ যায়, সেদিনই সেখানে একজন বললে—পণ্ডিত মশাই, চাল বড্ড আক্রা হবে, কিছু চাল এ সময়ে কিনে রাখলে ভাল হয়।

—কত আক্রা হবে ?

—তা ধরুন মণে দু টাকা চড়া আশ্চয্যি নয়।

কথাটা উপস্থিত কেউই বিশ্বাস করলে না। শান্তিস্বস্ত্যয়ন এবং গাঁ বন্ধ করার প্রক্রিয়া দেখবার জন্য আশপাশ থেকে অনেক লোক জড়ো হয়েছিল। গ্রামের চাষীরা বললে—মণে দু টাকা! তা'হলি আর ভাবনা ছেল না। কে বলেচে এ সব কথা ?

আগেকার বক্তা নিতান্ত বাজে লোক নয়—ধান চালের চালানি কাজ করেচে, এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে বলে মনে হয়। সে জোর গলায় বললে—তোমরা কিছু বোঝো না হে—আমার মনে হচ্চে গতিক দেখে, চালের দর ঠিক বাড়বে। আমি এ কারবার অনেকদিন ধরে করে আসচি, আমি বুঝতে পারি।

কথাটা কেউ গায়ে মাখলে না। তখন গাঁ বন্ধ করার ব্যাপার নিয়ে সকলে গঙ্গাচরণকে সাহায্য করতে ব্যস্ত। হোম শেষ ক'রে পুজো আরম্ভ করতে গঙ্গাচরণ পুরো তিনটি ঘণ্টা কাটিয়ে দিলে। এসব অজ পাড়াগাঁ, এখানকার হাল-চাল ভালই জানা আছে তার। পয়সা কি অমনি অমনি রোজগার হয় ? তিনটি মাটির কলসী সিঁদুর দিয়ে চিত্রিত করতে হয়েচে, তালপাতার তীর বানিয়ে চারকোণে পুঁতে পৈতের সুতো দিয়ে সেগুলো পরস্পর বাঁধতে হয়েচে, গাবকাঠের পুতুল তৈরি করতে হয়েচে গ্রাম্য ছুতোর দিয়ে, তেল সিঁদুর লেপে সেটাকে তেমাথা রাস্তায় পুঁততে হয়েচে—হাঙ্গামা কি কম ? সে যত বিদঘুটে ফরমাস করে, গ্রামের লোকের তত শ্রদ্ধা বেড়ে যায় তার ওপরে।

ওর কানে গেল লোক বলাবলি করচে—বলি, এ কি তুই যা তা পেলি রে ? ও'র পেটে এলেম কত ? যাকে বলে পণ্ডিত। এ কি তুই বাগান গাঁর দীনু ভট্‌চায পেয়েছিস ?

গঙ্গাচরণ হেঁকে বললে—নিষ্কালি সরা দুখানা আর শ্বেত আকন্দের ডাল দুটো—

ঠিক দুপুরবেলা, এখন এ সব জিনিস কোথা থেকে যোগাড় হয়, আঁর কেই বা আনে। সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো।

একজন বিনীত ভাবে বললে—আজ্ঞে, এ গাঁয়ে তো কুমোর নেই, নিষ্কালি সরা এখন কোথায় পাই ?

গঙ্গাচরণ রাগের সুরে বললে—তবে থাকলো পড়ে, ফাঁকি-জুকির কাজ আমায় দিয়ে হবে

মাতব্বর লোকেরা সকলকে কথাটা বলে বুঝিয়ে দিলে।

সন্ধ্যার আগে গরুর গাড়ী করে ফিরচে, পথে গ্রাম্য পুরোহিত দীনু ভট্চায এসে বললে—নমস্কার, চললেন—

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আমার একটা কথা আছে, গাড়ী থেকে নেমে একটু শুনুন—

গঙ্গাচরণ গাড়ী থেকে নেমে একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে দীনু ভট্চাযের সঙ্গে কথা বললে। দীনু ওর হাত ধরে বললে—আমার একটা অনুরোধ—

—হ্যাঁ হ্যাঁ—বলুন—

—আমায় কিছু দিয়ে যান আজ যা পেলেন—

—কেন ?

—আমি না খেয়ে মরচি। ঘরে এক দানা চাল নেই। চালের দাম হু হু ক'রে বাড়চে। ছিল সাড়ে চার, হোল ছ'টাকা। পাঁচ-ছটি পুষ্যি নিয়ে এখন চালাই কি ক'রে বলুন? আমি নিজে এই বুড়ো বয়সে রোজকার না করলে সংসার চলে না। অথচ বুড়ো হয়ে পড়েচি বলে এখন আর কেউ ডাকেও না, চোকি আর তেমন ভাল দেখি নে।

গঙ্গাচরণ চুপ করে থেকে বললে—তাই তো—বড় মুশকিল দেখ্চি। আপনার বয়স কত ?

—উনসত্তর যাচ্চে। মেয়েরা বড়, ছেলে বড় হোলে ভাল ছিল। এ বুড়ো বয়সে রোজকার করার কেউ নেই আমি ছাড়া।

—চালের দাম কত চড়েচে ?

—আরও নাকি চড়বে শুনচি। এখনই খেতে পাচ্চি নে—আরও বাড়লে কি কিনে খেতে পারবো! এই যুদ্ধুর দরুণ নাকি অমনটা হচ্চে—

গঙ্গাচরণ মাঝে-মিশালে শোনে বটে যুদ্ধের কথা। মাঝে মাঝে দু-একখানা এরোপ্লেন মাথার ওপর দিয়ে যাতায়াত করতে দেখেচে। তবে এ অজ চাষাগাঁয়ে কেউ খবরের কাগজ নেয় না, শহরও সাত-আট মাইল দূরে। গঙ্গাচরণ নিজের ধান্দায় ব্যস্ত থাকে। ওসব চর্চা করবার সময়ও তার নেই। তবু কথাটা তাকে ভাবিয়ে তুললে। সে বুড়ো ভট্চাযকে বললে—যা চাল পেয়েছি, তা থেকে কিছু আপনি নিয়ে যান—আর কিছু ডাল আর গাওয়া ঘি—

দীনু ভট্চায বললে—না, গাওয়া ঘি আমার দরকার নেই। বলে ভাত জোটে না, গাওয়া ঘি! আচ্ছা, আমি এই কাপড়ের মুড়োতেই চাল ডাল বেঁধে নিই। আপনি আমায় বাঁচালেন। ভগবান আপনার ভাল করুন।

কথাটা ভাবতে ভাবতে গঙ্গাচরণ বাড়ী এসে পেঁছুল। অনঙ্গ-বৌ জিনিসপত্র দেখে খুব খুশি। বললে—চাল এত কম কেন ?

—এক বুড়ো বামুন ভট্চাযিকে কিছু দিয়ে এসেছি পথে।

—যাক গে, ভালই করেচ। দিলে তাতে কমে না, বরং বেড়ে যায়।

—শুনচি নাকি চালের দাম বাড়বে, সবাই বলচে।

—ছ'টাকা থেকে আরও বাড়বে! বল কি গো ?

—সবাই তো বলচে। যুদ্ধুর দরুণ নাকি এমন হচ্ছে—

—কার সঙ্গে যুদ্ধু বেধেচে গো ?

—সে সব তুমি বুঝতে পারবে না। আমাদের রাজার সঙ্গে জার্মানি আর জাপানের—সব জিনিস নাকি আক্রা হয়ে উঠবে।

—হোক গে, আমাদের তো অর্ধেক জিনিস কিনে খেতে হয় না। তবে চালটা যদি বেড়ে যায়—

—সেই কথাই তো ভাবচি—

সেদিন বিকেলে বিশ্বাস মশায়ের বাড়ী বসে এই সব কথার আলোচনা হচ্ছিল। বিশ্বাস মশায় বললেন—আমাদের ভাবনা কি? ঘরে আমার দু'গোলা ধান বোঝাই। দেখা যাবে এর পরে।

বৃদ্ধ নবদ্বীপ ঘোষাল বললে—এ সব হ্যাঙ্গামা কতদিনে মিটবে ঠাকুর মশাই? শুনচি নাকি কি একটা পুর জারমান নিয়ে নিয়েচে?

বিশ্বাস মশায় বললে—সিঙ্গাপুর—

নবদ্বীপ বললে—সে কোন্ জেলা? আমাদের এই যশোর, না খুলনে? মামুদপুরের কাছে?

বিশ্বাস মশায় হেসে বললেন—যশোরও না, খুলনেও না। সে হোল সমুদ্দুরের ধারে। বোধ হয় পুরীর কাছে, মেদিনীপুর জেলা। তাই না পণ্ডিত মশাই?

গঙ্গাচরণ ভাল জানে না, কিন্তু এদের সামনে অজ্ঞতাটা দেখানো যুক্তিযুক্ত নয়। সুতরাং সে বললে—হ্যাঁ। একটু দূরে—পশ্চিম দিকে। ঠিক কাছে নয়।

নবদ্বীপ বললে—পুরীর কাছে? আমার মা একবার পুরী গিয়েছিলেন। পুরী, সাক্ষীগোপাল, ভুবনেশ্বর। সে বুঝি মেদিনীপুর জেলা?

বিশ্বাস মশায় বললেন—হ্যাঁ।

ভৌগোলিক আলোচনা শেষ হলে যে যার বাড়ীর দিকে চলে গেল।

গঙ্গাচরণ পাঠশালায় বসে পরদিন ছেলেদের জিজ্ঞেস করলে—এই সিঙ্গাপুর কোথায় জানিস?

কেউ বলতে পারলে না, কেউ নামই শোনে নি।

গঙ্গাচরণ নিজের ছেলের দিকে হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে বললে—হাবু, সিঙ্গাপুর কোথায়?

হাবু দাঁড়িয়ে উঠে সগর্বে বললে—পুরীর কাছে, মেদিনীপুর জেলায়।

পাঠশালার অন্যান্য ছেলেরা ঈর্ষামিশ্রিত প্রশংসার দৃষ্টিতে হাবুর দিকে চেয়ে রইল।

বৈশাখের মাঝামাঝি থেকে কতকগুলি আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ্য করলে গঙ্গাচরণ বাজারের জিনিসপত্র কিনতে গিয়ে। প্রত্যেক জিনিসের দাম ক্রমশঃ চড়ে যাচ্ছে। কিন্তু তা যাক গে, সেদিন হাটে একটা ঘটনা দেখে শুধু গঙ্গাচরণ নয়, হাটের সব লোকই অবাক হয়ে গেল।

ঘটনাটা অতি সামান্য। ইয়াসিন বিশ্বাসের বড় গোলাদারি দোকান। তাতে কেরোসিন তেল আনতে গিয়ে অনেকে শুধু হাতে ফিরে গেল। তেল নাকি নেই?

গঙ্গাচরণের বিশ্বাস হলো না কথাটা। সে নিজেও তেল নেবে। তেলের বোতল হাতে দোকানে গিয়ে দাঁড়াতেই ইয়াসিনের দাদা ইয়াকুব বললে—তেল নেই পণ্ডিত মশাই—

—নেই ?

—আজ্ঞে না।

—তেল আনো নি ?

—আজ্ঞে পাওয়া যাচ্চে না।

—সে কি কথা ? কেরাসিন পাওয়া যাচ্চে না ?

—আমাদের চালান আসে নি এবার একদম। শুনলাম নাকি মহকুমা হাকিমের কাছে দরখাস্ত করতে হবে চালান পাঠাবার আগে।

—কবে আসতে পারে ?

—আজ্ঞে কিছু ঠিক নেই—

গঙ্গাচরণ বোতল হাতে বেরিয়ে আসচে, ইয়াকুব সুর নিচু করে বললে—বাবু, এই বেলা কিছু নুন আর কিছু চাল কিনে রাখুন—ও দুটো জিনিস যদি ঘরে থাকে, তা হলে কন্টস্রেস্ট করে আধপেটা খেয়েও চলবে !

—কেন, ও দুটো জিনিসও কি পাওয়া যাবে না নাকি ?

—পণ্ডিত মশাই, সাবধানের মার নেই, আমরা হোলাম ব্যবসাদার মানুষ, সব দিকে নজর রেখে চলতি হয় কিনা ? কে জানে কি হয় মশাই।

গঙ্গাচরণ ভাবতে ভাবতে বাড়ী চলে এসে স্ত্রীকে বললে—আজ একটি আশ্চর্য কাণ্ড দেখলাম—

—কি গা ?

—পয়সা হোলেও জিনিস মেলে না এই প্রথম দেখলাম। কোনো দোকানেই নেই—আরও একটি কথা বললে দোকানদার। চালও কিনে রাখতে হবে নাকি।

অনঙ্গ-বৌ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে—দূর ! রেখে দাও ওদের সব গাঁজাখুরি কথা। চাল পাওয়া যাবে না, নুন পাওয়া যাবে না, তবে দুনিয়া পৃথিমে লোকে বাঁচতে পারে কক্‌খনো ? কি খাবে এখন ?

—যা দেবে !

অনঙ্গ টাটকা-ভাজা মুড়ি গাওয়া ঘিতে মেখে নিয়ে এসে দিলে—তার সঙ্গে শসা কুচোনো। বললে—একটু চিনি দেবো, ওর সঙ্গে মেখে খাবে ?

—নাঃ, চিনি আমার ভাল লাগে না। হাবু কোথায় ?

—বাড়ী নেই। বিশ্বেস মশায়ের নাতির সঙ্গে ওর খুব ভাব হয়েচে কিনা। ডেকে নিয়ে গেল এসে। বড় মানুষের নাতির সঙ্গে ভাব থাকা ভালো। সময়ে অসময়ে দুটো জিনিস চাইলেও পাওয়া যাবে। সেজন্যে আমিও যেতে বারণ করি নি।

—এসো দুটো মুড়ি খাও আমার সঙ্গে।

অনঙ্গ-বৌ সলজ্জ হেসে বললে—আহা, রস যে উথলে উঠচে। আজ বাদে কাল যে ছেলের বৌ ঘরে আনতে হবে খেয়াল আছে ?

বলেই এসে স্বামীর পাশে বসে বাটি থেকে একমুঠো ঘি-মাখা মুড়ি তুলে নিয়ে মুখে ফেলে দিল। স্বামীর দিকে বিলোল কটাক্ষে চেয়ে বললে মনে পড়ে, সেই ভাতছালায় বিলের ধারে একদিন তুমি আর আমি এক বাটি থেকে চিঁড়ের ফলার খেয়েছিলাম ? হাবু তখন ছোট।

অনঙ্গ-বৌয়ের হাসি ও চোখের বিলোল দৃষ্টি প্রমাণ করিয়ে দিলে সে বিগতযৌবনা নয়, পুরুষের মন এখনও হরণ করার শক্তি সে হারায় নি।

গঙ্গাচরণ স্ত্রীর দিকে চেয়ে রইল মুগ্ধ দৃষ্টিতে।

ফাল্গুন মাসের শেষে গঙ্গাচরণ একদিন পাঠশালার ছুটি দিয়ে চলে আসছে, কামদেবপুরের দুর্গা পণ্ডিত পথে ওকে ধরে বললে—ভাল আছেন? সেদিন গিয়েছিলেন কামদেবপুর, আমি ছিলাম না, নমস্কার।

—নমস্কার। ভাল আছেন?

—একরকম চলে যাচ্ছে। আপনার সঙ্গেই দেখা করতে আসা।

—কেন বলুন?

—আমার তো আর ওখানে চলে না। পৌনে সাত টাকা মাইনেতে একেবারে অচল হোল। চালের মণ হয়েচে দশ টাকা।

গঙ্গাচরণের বুকটার মধ্যে ধ্বক করে উঠলো। অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দুর্গা পণ্ডিতের দিকে চেয়ে সে বললে—কোথায় শুনলেন?

—আপনি জেনে আসুন রাধিকাপুরের বাজারে।

—সেদিন ছিল চার টাকা, হোল ছ'টাকা, এখন অমনি দশ টাকা!

—মিথ্যে কথা বলি নি। খোঁজ নিয়ে দেখুন।

—মণে চার টাকা চড়ে গেল! বলেন কি?

—তার চেয়েও একটি কথা শোনলাম, তা আরও ভয়ানক। চাল নাকি এবার না কিনলে এরপরে বাজারে আর মিলবে না। শুনে তো পেটের মধ্যে হাত পা ঢুকে গেল মশাই।

গঙ্গাচরণের সঙ্গে সঙ্গে দুর্গা পণ্ডিত ওর বাড়ী পর্যন্ত এল। গঙ্গাচরণের বাইরেরা ঘর নেই, উঠোনের ঘাসের ওপরে মাদুর পেতে দুর্গা পণ্ডিতের বসবার জায়গা করে দিলে। তামাক সেজে হাতে দিলে। বললে—ডাব কেটে দেবো? খাবেন?

—হ্যাঁ, সে তো আপনার হাতের মুঠোর মধ্যে। বেশ আছেন।

—আর কিছু খাবেন?

—না, না, থাক। বসুন আপনি।

একথা ওকথা হয়, দুর্গা পণ্ডিত কিন্তু ওঠবার নাম করে না।

গঙ্গাচরণ ভাবলে, কামদেবপুর এতটা পথ—যাবে কি করে? সন্দে তো হয়ে গেল। আরও বেশ কিছুক্ষণ কাটলো। গঙ্গাচরণ কিছু বুঝতে পারচে না।

এখনও যায় না কেন? শীতের বেলা, কোন্ কালে সূর্য অস্তে গিয়েচে।

হঠাৎ দুর্গা পণ্ডিত বললে—হ্যাঁ, ভালো কথা—এবেলা আমি দুটো খাবো কিন্তু এখানে।

—খাবেন? তাহোলে বাড়ীর মধ্যে বলে আসি।

অনঙ্গ-বৌ রান্নাঘরে চাল ভাজছিল, স্বামীকে দেখে বললে—ওগো, তোমার সেই পণ্ডিত মশায়ের জন্যে দুটো চাল ভাজচি যে। তেল নুন মেখে তোমরা দুজনেই খাওগে—

—শোনো, পণ্ডিত মশাই রাত্তিরে এখানে খাবেন।

—তুমি বললে বুঝি?

—না উনিই বলচেন। আমি কিছু বলি নি।

—অন্য কিছু নয়, কি দিয়ে ভাত দিই পাতে ? একটু দুধ যা ছিল ওবেলা তুমি আর হাবু খেয়েচ।

দুর্গা পণ্ডিতের কথাবার্তা শুনে গঙ্গাচরণের মনে হোল সে খুব ভয় পেয়েচে। এমন একটা অবস্থা আসবে সে কখনো কল্পনাও করতে পারে নি। ওর ভয়ের ছোঁয়াচ এসে গঙ্গাচরণের মনেও পেঁছায়। বাইরে ঘোড়ানিম গাছটার তলায় অন্ধকার রাত্রে বসবার জন্যে হাবু একটা বাঁশের মাচা করেছিল। দুই পণ্ডিতে সেই মাচার ওপর একটি মাদুর বিছিয়ে দিব্যি ফুরফুরে ফাগুনে হাওয়ায় বসে তামাক ধরিয়ে কথাবার্তা বলছিল। হাবু এসে বললে—বাবা, নিয়ে এসো ওঁকে, খাওয়ার জায়গা হয়েচে—

মুগের ডাল, আলুভাতে, পেঁপের ডালনা ও বড়াভাজা। অনঙ্গ-বৌ রাঁধতে পারে খুব ভাল। দুর্গা পণ্ডিতের মনে হোল এমন সুস্বাদু অন্নব্যঞ্জন অনেক দিন খায় নি। হাবু বললে—মা জিজ্ঞেস করচে আপনাকে কি আর দুখানা বড়াভাজা দেবে ?

গঙ্গাচরণও ওই সঙ্গে খেতে বসেচে। বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ, নিয়ে আয় না। জিজ্ঞেস করাকরি কি ?

অনঙ্গ-বৌ আড়ালে থেকে হাবুর হাতে পাঠিয়ে দিলে একটা রেকাবিতে কিছু পেঁপের ডালনা, ক'খানা বড়াভাজা।

গঙ্গাচরণ বললে—ওগো, তুমি ও'র সামনে বেরোও, উনি তোমার ধনপতি কাকার বয়েসী। আপনার বয়েস আমার চেয়ে বেশি হবে, কি বলেন ?

দুর্গা পণ্ডিত বললে—অনেক বেশি। বৌমাকে আসতে বলুন না ? একটা কাঁচা ঝাল নিয়ে আসুন।

একটু পরে অনঙ্গ-বৌ লজ্জা-কুণ্ঠা-জড়িত সুঠাম সুগৌর কাঁচের চুড়ি-পরা হাতে গোটা-দুই কাঁচা লংকা এনে দুর্গা পণ্ডিতের পাতে ফেলে দিতেই দুর্গা পণ্ডিত ওর দিকে মুখ তুলে চেয়ে বললে—মা যে আমার লক্ষ্মী পিরতিমে। আমার এক ভাইঝির বয়িসী বটে। কোনো লজ্জা নেই আমার সামনে বৌমা—একটু সরষের তেল আছে। দাও তো মা—

হাবু বললে—মা বলচে, দুধ নেই। একটু তেঁতুল গুড় মেখে ভাত ক'টা খাবেন ?

—হাঁ হাঁ, খুব। দুধ কোথায় পাবো ? বাড়ীতেই কি রোজ দুধ খাই নাকি ?

দুর্গা পণ্ডিত এই বয়সেও কিন্তু বেশ খেতে পারে। মোটা আউশ চালের রাঙা রাঙা ভাত শুধু তেঁতুল গুড় মেখেই যা খেলে, গঙ্গাচরণের তা দু'বেলার আহার। অনঙ্গ-বৌ কিন্তু খুব খুশি হোল দুর্গা পণ্ডিতের খাওয়া দেখে। যে মানুষ খেতে পারে, তাকে নাকি খাইয়ে সুখ। নিজের জন্যে রাখা বড়াভাজাগুলো সে সব দিয়ে দিলে অতিথির পাতে।

গঙ্গাচরণ মনে মনে ভাবলে পোনে সাত টাকায় বেচারী নিশ্চয়ই আধ পেটা খেয়ে থাকে—

রাত দশটার বেশী নয়। একটু ঠাণ্ডা রাতটা। আবার এসে দুজনে বসলো নিমগাছের তলায় বাঁশের মাচায়। হাবু তামাক সেজে এনে দিলে।

দুর্গা পণ্ডিত বললে—এখন কি করি আমায় একটা পরামর্শ দাও তো ভায়া। যে রকম শুনচি—

গঙ্গাচরণ চিন্তিত সুরে বললে—তাই তো ! আমারও তো কেমন কেমন মনে হচ্চে। কেরাসিন তেল বাজারে আর পাওয়া যাচ্ছে না, আবার কাল থেকে শুনচি দেশলাইও নাকি নেই।

—সে মরুক গে, যাক কেরাসিন তেল। অন্ধকারে থাকবো। কিন্তু খাবো কি? চাল নাকি মোটেই মিলবে না। দামও চড়বে।

—দাম আরও চড়বে? দশ টাকা হয়েচে, আরও?

—একজন ভালো লোক বলছিল সেদিন। এই বেলা কিছু কিনে রাখতি পারলে ভাল হোত, কিন্তু পোনে সাত টাকা মাইনেতে রোজকার চাল কেনাই কঠিন হয়ে পড়েচে! আমাদের স্কুলের সেক্রেটারি হোল ও গাঁয়ের রতিকান্ত ঘোষ। গোলাপালা আছে বাড়ীতে—ধানচাল মজুদ আছে। সেদিন বললাম আমায় একমণ চাল দিন, মাইনে থেকে কেটে নেবেন। তা আধমণ দিতে রাজী হয়েচে।

—আপনার কত চাল লাগে রোজ?

—তা সকালবেলা উঠলি একপালি করে চালির খরচ। খেতে দুবেলায় আট-ন'টি প্রাণী। কি করে চালাই বলো তো ভায়া? ও আধমণ চালে আমার ক'দিন?

গঙ্গাচরণ মনে মনে বললে—তার ওপর খাওয়ার যা বহর। অমন যদি সকলের হয় বাড়ীতে, তবে রতিকান্ত ঘোষের বাবাও চাল যুগিয়ে পারবে না—

দুর্গা পণ্ডিত কিছুতেই ঘুমুতে যায় না। মাঝে পড়ে গঙ্গাচরণেরও ঘুম হয় না। অতিথিকে ফেলে রেখে সে একা শুতে যায় কি করে? তার নিজেরও যে ভয় একেবারে না হয়েচে তা নয়।

দুর্গা পণ্ডিত বললে—একটা বিহিত পরামর্শ দাও তো ভায়া। ওখানে একা একা থাকি, যত সব অজ মুখ্যুদের মধ্যিখানে। আমরা কি পারি? আমরা চাই একটু সৎসঙ্গ, বিদ্যে পেটে আছে এমন লোকের সঙ্গ। নয়তো প্রাণ যে হাঁপিয়ে ওঠে। না কি বল?

—ঠিক ঠিক!

—তাই ভাবলাম যদি পরামর্শ করতে হয় তবে ভায়ার ওখানে যাই। বাজে লোকের সঙ্গে পরামর্শ করে কি হবে? তুমি যা বুদ্ধি দিতে পারবে, চাষাভুষো লোকের কাছ থেকে সে পরামর্শ পাবো না। যুদ্ধের খবর কি?

—জাপানীরা সিঙ্গাপুর নিয়ে নিয়েচে।

—শুধু সিঙ্গাপুর কেন? ব্রহ্মদেশও নিয়ে নিয়েচে। জানো না সে খবর?

—না—হয়ে—শুনি নি তো? ব্রহ্মদেশ? সে তো—

—যেখান থেকে রেঙ্গুন চাল আসে রে ভায়া। ওই যে সস্তা, মোটা মোটা আলো চাল, সিদ্ধও আছে, তবে আমি আতপ চালটাই খাই।

এ আবার এক নতুন খবর বটে। কাল বিশ্বাস মশায়ের চণ্ডীমণ্ডপে বসে গল্প করবার একটা জিনিস পাওয়া গেল বটে। উঃ, এ খবরটা সে এত দিন জানে না? কেউ তো বলেও নি। জানেই বা কে এ অজ চাষা-গাঁয়ে? তবে গঙ্গাচরণের কাছে সবটাই ধোঁয়া ধোঁয়া। রেঙ্গুন বা ব্রহ্মদেশ ঠিক কোন্ দিকে তা সে জানে না। পুব বা দক্ষিণ দিকে কোন্ জায়গায়। অনেক দূর।

পরদিন দুপুরবেলাতেও দুর্গা পণ্ডিত এখানেই আহার করলে। অনঙ্গ-বৌ তার জন্য দু'তিন রকমের তরকারি রান্না করলে। খেতে ভালবাসে, ব্রাহ্মণ অতিথি। তাদের চেয়ে অনেক গরীব।

অনঙ্গ-বৌ হাবুকে সকালে উঠেই বলেচে—একটা মোচা নিয়ে আয় তো তোর সয়াদের বাগান থেকে।

স্ত্রীকে মোচা কুটতে দেখে গঙ্গাচরণ বললে—আজ যে অতিথি সৎকারের খুব বহর দেখচি—

—ভারি তো। একটু মোচার ঘণ্ট রাঁধবো, আর একটু সুক্তুনি—

—বেশ বেশ। অতিথির দোহাই দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও হয়ে যাবে।

—হ্যাঁগা, পণ্ডিত মশাই বড় গরীব, না? দেখে বড় কষ্ট হয়। কি রকম কাপড় পরে এয়েচে, পায়ে জুতো নেই।

—তা অবস্থা ভালো হলে কি সাত টাকা মাইনেতে পড়ে থাকে পাঠশালায়! আজ ওকে একটু ভালো করে খাওয়াও।

—একটু দুধ যোগাড় করে দেবে?

—দেখি যদি নিবারণ ঘোষের বাড়ীতে মেলে। ওটা কাঁচকলার মোচা নয় তো, তা'হলে কিন্তু এত তেতো হবে যে মুখে দেওয়া যাবে না তরকারি।

—নাগো, এ কাঁটালি কলার মোচা। আমাকে তুমি আমার কাজ শেখাতে এসো না বলচি।

দুপুরবেলা দুর্গা পণ্ডিত খেতে এসে সপ্রশংস বিস্ময়ের দৃষ্টিতে পাতের দিকে চেয়ে বললে—এ যে রীতিমত ভোজের আয়োজন করেছেন দেখচি? আহা, বৌমা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। এত সব রেঁধেচেন বসে বসে? ওমা, কোথায় গেলে গো মা?

অনঙ্গ-বৌ ঘরে ঢুকে সকুণ্ঠিত সলজ্জভাবে মুখ নীচু করে রইল।

দুর্গা পণ্ডিত ভাল করে মোচার ঘণ্ট দিয়ে অনেকগুলো ভাত মেখে গোগ্রাসে খেতে খেতে বললে—সত্যি, এমন তৃপ্তির সঙ্গে কতকাল খাই নি।

গঙ্গাচরণের মনে হোল দুর্গা পণ্ডিত কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলচে না। ওর স্বরে কপট ভদ্রতা নেই। সত্যি কথাই বলচে ও, এমন কি অনেক দিন পরে ও যেন আজ পেট ভরে দুটি ভাত খেতে পেলে।

অনঙ্গ-বৌ বললে—ও হাবু, বল আর কি দেবো? মোচার ঘণ্ট আর একটু আনি?

পরিশেষে ঘন জ্বাল দেওয়া এক বাটি দুধ আর নতুন আখের গুড়। দুর্গা পণ্ডিত সত্যিই অভিভূত হয়ে পড়েচে, খাওয়ার সময় ওর চোখ দুটো যেন কেমন ধরনের চক্‌চক্ করচে। শীর্ণ চেহারা শুধু বোধ হয় না খেয়ে খেয়ে। অনঙ্গ-বৌয়ের মনে মমতা জন্মালো। তাদের যদি অবস্থা থাকতো দেবার, ইচ্ছে হয় রোজ ওই অনাহার-শীর্ণ দরিদ্র পণ্ডিত মশাইয়ের পাতে এমনিতর নানা ব্যঞ্জন সাজিয়ে খেতে দেয়।

—আসি বৌমা, আপনাদের যত্নের কথা ভোলবো না কখনো। বাড়ী গিয়ে মনে রাখবো।

অনঙ্গ-বৌয়ের চোখ দু'টি অশ্রুসজল হয়ে উঠলো।

—যদি কখনো না খেয়ে বিপদে পড়ি, তুমি একটু ঠাঁই দিও মা অন্নপূর্ণা। বড্ড গরীব আমি।

দুর্গা পণ্ডিতের অপসিয়মাণ ক্ষীণদেহ আম-শিমুলের বনের ছায়ায় ছায়ায় দূর থেকে দূরান্তরে গিয়ে পড়লো অনঙ্গ-বৌয়ের স্নেহদৃষ্টির সম্মুখে!

সেদিন এক বিপদ।

রাধিকানগরের বাজারে পরদিন বহুলোকের সামনে পাঁচু কুণ্ডুর চালের দোকান লুঠ হোল। দিনমানে এমন ধরণের ব্যাপার এ সব অঞ্চলে কখনো ঘটে নি। গঙ্গাচরণও সেখানে দাঁড়িয়ে। একটা বটতলায় বড় আটচালাওয়ালা দোকানটা। প্রথমে লোকে সবাই এলো চাল কিনতে, তারপর কিসে যে কি হোল গঙ্গাচরণ জানে না, হঠাৎ দেখা গেল যে দোকানের চারিপাশে একটা হৈচৈ গোলমাল। মেলা লোক দোকানে ঢুকচে আর বেরুচ্চে। ধামা ও থলে হাতে বহুলোক মাঠ ভেঙে বাঁওড়ের ধারে-ধারের পথে পড়ে ছুটচে। সন্ধ্যার দেরি নেই বেশি, সূর্যদেব পাটে বসে-বসে। গাছের মগডালে রাঙা রোদ।

একজন কে বললে—উঃ, দোকানটা কি করেই লুঠ হচ্চে।

গঙ্গাচরণও গিয়েছিল চাল কিনতে। হাতে তার চটের থলে। কিন্তু দোকানে দোকানে ঘুরে সে দেখলে চালের বাজারে সাড়ে বারো টাকা দর। গত হাটবারেও ছিল দশ টাকা চার আনা, একটা হাটের মধ্যে মণে একেবারে ন'সিকে চড়ে যাবে এ তো স্বপ্নের অগোচর। চাল কিনবে কি না-কিনবে ভাবচে, এমন সময় বিষম হৈচৈ।

লোকের ভিড় ক্রমশঃ পাতলা হয়ে আসচে, সবাই উর্ধ্বশ্বাসে ছুটচে। কেউ চাল নিয়ে ছুটচে, কেউ শুধু হাতে। গঙ্গাচরণ বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে ভাবচে তখনও, চাল কিনবে কিনা —এমন সময় পেছন থেকে দু'জন লোক এসে ওর ঘাড়ের ওপর পড়লো, তার মধ্যে একজন ওকে জাপটে ধরলে জোর করে ওর চটের থলে সুদ্ধ। গঙ্গাচরণ চমকে উঠে বললে—কে? কে?

কর্কশ কণ্ঠে কে একজন অস্পষ্ট দিবালোকে বলে উঠলো—চাল নিয়ে পালাচ্চো শালা—হাতে-নাতে ধরেচি!

গঙ্গাচরণ ঝাঁকি মেরে উঠে বললে—কে চাল চুরি করেচে? লোক চেনো না?

লোক দু'জন ওর সামনে এসে ভাল করে মুখ দেখলে। গঙ্গাচরণ চিনলে ওদের, বন্যেবেড়ের দফাদার সাধুচরণ মণ্ডল এবং ঐ ইউনিয়নের জনৈক চৌকিদার। ওরা কিন্তু গঙ্গাচরণকে চেনে না।

চৌকিদার বললে—শালা, লোক সবাই ভালো। সকলকেই আমরা চিনি। চাল ফেলালি ক'নে?

—আমার নাম গঙ্গাচরণ পণ্ডিত, নতুন গাঁয়ে আমার পাঠশালা। চাল কিনতে এসেছিলাম বাপু, ব্রাহ্মণকে যা তা বোলো না। আমায় সবাই চেনে এ দিগরে। ছেড়ে দাও—

সাধুচরণ দফাদার ওর সামনে এসে মুখ ভালো করে দেখে বললে—এ দেখচি পুরানো দাগী চোর। এর নাম মনে পড়চে না, বাঁধো একে।

ঠিক সেই সময় নতুন গাঁয়ের তিনজন লোক এসে পড়াতে গঙ্গাচরণ দাগী চোর ও চুরির অভিযোগ থেকে নিস্তার পেলে। এমন হাঙ্গামে গঙ্গাচরণ পড়ে নি জীবনে।

গঙ্গাচরণের ফিরতে রাত হয়ে গেল সেদিন। অনঙ্গ-বৌ বসে আছে চালের আশায়। এত রাত কখনো হয় না হাট করতে যেয়ে। ব্যাপার কি?

বিনোদ কাপালীর বোন ভান্ এসে বললে—কি করচো ঠাকরুণ দিদি ?

—এসো ভানু। বোসো ভাই—

—দাদাঠাকুর ক'নে ?

—রাধিকানগরে হাটে গিয়েচে, এখনো আসবার নামটি নেই।

—আজ নাকি খুব হ্যাংনামা হয়ে গিয়েছে হাটে। দাদা ফিরে এয়েচে, তাই বলছেল।

অনঙ্গ-বৌ উদ্বিগ্ন মুখে বললে—কি হ্যাংনামা রে ভানু ? হয়েচে কি ?

ভানু বললে—কি নাকি চালের দোকান লুঠ হয়েচে, অনেক লোককে পুলিসে ধরে নিয়ে গিয়েচে—এই সব।

অনঙ্গ-বৌ আশ্বস্ত হোল, তার স্বামী লুঠের ব্যাপারে কখনো থাকবে না, সুতরাং পুলিসে ধরেও নিয়ে যায় নি, হয়তো ওই সব দেখতে দেরি করে ফেলেচে। তবুও সে হাবুকে ডেকে বললে—ও হেবো, একটু এগিয়ে দেখ না—হাট থেকে লোকজন ফিরে এলো। এত দেরি হচ্চে কেন ?

এমন সময় শূন্য চালের থলে হাতে গঙ্গাচরণ বাড়ী ঢুকে বললে—ওঃ, কি বিপদেই আজ পড়ে গিয়েছিলাম ! আমাকে কিনা ধরেচে চোর বলে !

অনঙ্গ বলে উঠলো—সে কি গো ?

—হ্যাঁ, ওই বন্যেবেড়ের সাধুচরণ দফাদার আর দু ব্যাটা চৌকিদার।

—ওমা, তারপর ?

—তারপর বাঁধে আর কি। শেষে এ গাঁয়ের লোকজন গিয়ে না পড়লে বেঁধে নিয়ে যেতো।

—কি সব্বনাশ গা ! মা সাত-ভেয়ে কালীর পুজো দেবো স পাঁচ আনা। মা রক্ষা করেচেন।

—যাক, সে তো গেল এক বিপদ, ইদিকে যে তার চেয়েও বিপদ। চাল পেলাম না হাটে।

—তুমি ভেবো না, আমি রাতটা চালিয়ে দেবো এক রকমে। কাল দুপুরেও চালাবো। সারাদিনে চাল যোগাড় করে আনতে পারবে এখন খুবই।

বাইরে এসে তাড়াতাড়ি ভানুকে বললে—ভানু দিদি, আমায় এক পালি চাল ধার দিতে পারবে আজ রাতের মত ? উনি হাটে গিয়ে হ্যাংনামাতে পড়ে গিয়েছিলেন, চাল কিনতে পারেন নি।

ভানু বললে—এখুনি পেঠিয়ে দিচ্চি ঠাকরুণ দিদি।

—না দিলে কিন্তু রাতে ভাত হবে না !

—ওমা, সে কি কথা ঠাকরুণ দিদি, নয়তো আমি নিজে নিয়ে আসচি।

ভানু চলে গেল বটে কিন্তু চাল নিয়ে এলো না। এই আসে এই আসে করে প্রায় ঘণ্টা খানেক কেটে গেল, তখনও ভানুর দেখা নেই। অনঙ্গ-বৌ আশ্চর্য হয়ে গেল, ব্যাপার কি ? এই গ্রামে এসে পর্যন্ত যার কাছে যা মুখ ফুটে চেয়েচে সে, তক্ষুনি পরম খুশির সঙ্গে সে জিনিসটা এনে দিয়ে যেন কৃতার্থ হয়ে গিয়েচে। এই প্রথমবার অনঙ্গ বৌকে সামান্য এক কাঠা চাল ধার চেয়ে বিফল হোতে হোল।

এদিকে বিপদের ওপর বিপদ, স্বামী হাট থেকে এসে কোথায় যেন বেরিয়ে গেলেন, বে

হয় হাটের গল্প বলবার জন্যে বিশ্বাস মশায়ের বাড়ী, কি করেই বা তাঁকে সে জানায় ? এ-স খিদের ওপর ভাত খেতে পাবে না।

সাতপাঁচ ভাবচে, এমন সময় ভানু উঠোন থেকে ডাকলে—ও ঠাকরুণ দিদি ?

অনঙ্গ-বৌয়ের প্রাণ এল ফিরে। সে তাড়াতাড়ি বাইরে এসে বললে—বলি কি কাণ্ডখানা, হ্যাঁ রে ভানু ?

ভানু দাওয়ায় উঠে এসে শুকনো মুখে বললে—ঠাকরুণ দিদি, আমি সেই থেকে চাল যোগাড় করবার জন্যে তিন-চার বাড়ী ঘুরে বেড়িয়েচি।—

—কেন তোদের বাড়ী কি হোল ?

—নেই। হাটে পায় নি আজ।

—হাটে কেন ? ক্ষেতের ধান ?

—আ মোর কপাল ! ক্ষেতের ধান আর কনে ! ছ'টাকা মণ যেমন হোল, অমনি কাকা সব ধান আড়তে নিয়ে গেল গাড়ী পুরে। বিক্রি করে নগদ টাকা ঘরে এনলে। ফি-জনে জুতো কেনলে, কাপড় কেনলে, কাকীমা ঘটি বাসন কেনলে, মাছ খালে, সন্দেশ খালে, মাংস খালে। নবাবী করে সে টাকাও উড়িয়ে ফেললে। এখন সে ধানও নেই, সে টাকাও নেই। ক'হাট কিনে খাতি হচ্ছে মোদেরও।

—অন্য বাড়ী যে ঘুরলি বললি ?

-মোদের পাড়ায় কারো ঘরে ধান নেই ঠাকরুণ দিদি। সব কিনে খাওয়ার ওপর ভরসা।

ভানু আঁচলের গেরো খুলতে খুলতে বললে।

—ওতে কি রে ?

-এক খুঁটি মোটা চাল ওই ক্ষুদে গয়লার নাত-বৌয়ের কাছ থেকে চেয়ে-চিন্তে—

—হ্যাঁ রে, তারা তো বড্ড গরীব। তুই আনলি, তাদের খাবার আছে তো ? দাঁড়া—

—সে আমি না জেনে আনি নি দিদি ঠাকরুণ। ওরা লোকের ধান ভানে কিনা ? আট ঠা ধানে এক কাঠা ধান বানি পায়। বানির ধান ভেনে খোরাকি চালায়।

অনঙ্গ-বৌ একটু ভেবে বললে—আমার একটা উপকার করবি ভানু ?

—কি ?

—আচ্ছা সে পরে বলবো এখন। দে চাল ক'টা—

—এক খুঁটি চালি, রাতটা হবে এখন তো ? আর না হলিই বা কি করবা ঠাকরুণ ? কত কষ্টে যে চাল ক'ডা যোগাড় ক'রে এনিচি তা আমিই জানি।

গঙ্গাচরণ ভাত খেতে বসলো অনেক রাতে। ডাল, ভাত আর পুঁইশাকের চচ্চড়ি। বাড়ীর উঠোনেই সুগৃহিণী অনঙ্গ-বৌ পুঁইমাচা তুলে দিয়েছে, লাউমাচা তুলেছে, কিছু ঢ্যাঁড়স, কিছু নটেশাকের ক্ষেত করেছে। হাবু ও নিজে দুজনে মিলে জল দিয়েছে আগে আগে, তবে এই সব গাছ বেঁচে আজ তরকারি যোগাচ্ছে।

অনঙ্গ-বৌ বললে—আর দুটো ভাত মেখে নাও, ডাল দিয়ে পেট ভরে খাও—

—এ চাল দুটো ছিল বুঝি আগের দরুণ ?

—হুঁ।

—কাল হবে ?

—কাল হবে না। সকালে উঠেই চাল যোগাড় করো। রাতটা টেনেটুনে হয়ে গেল।

—সেই বিশ্বাস মশায়ের দরুণ ধানের চাল !

—হুঁ।

অনঙ্গ-বৌ স্বামী-পুত্রকে পেট ভরে খাইয়ে সে-রাতে এক ঘটি জল আর একটু গুড় খে উপোস করে রইলো।

দিন পনেরো কেটে গেল।

গ্রামে গ্রামে লোকে একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেচে। চাল পাওয়া বড় কঠিন হয়ে পড়েচে।

রাধিকানগরের হাটে, যেখানে আগে বিশ-ত্রিশখানা গ্রামের চাষাদের মেয়েরা ঢেঁ ভানা চাল নিয়ে আসতো, সেখানে আজকাল সাত-আটজন স্ত্রীলোক মাত্র দেখা যায়। তা চাল পাওয়া যায় না। বড়তলার মোড়ে আর ওদিকে সামটা বিলের ধারে ক্রেতার দল ভি পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সেখান থেকে চাল কাড়াকাড়ি করে নিয়ে যায়।

হাটুরে লোকেরা চাল বড় একটা পায় না।

আজ দু'হাট আদৌ চাল না পেয়ে গঙ্গাচরণ সতর্ক হয়ে এসে সামটা বিলের ধারে দাঁড়িয়ে একটা বড় জিউলি গাছের ছায়ায়। সঙ্গে আরও চার-পাঁচজন লোক আছে বিভিন্ন গ্রামের বেলা আড়াইটে থেকে তিনটের মধ্যে। রোদ খুব চড়া।

কয়রা গ্রামের নবীন পাড়ুই বলচে—বাবাঠাকুর, আমরা তো ভাত না খেয়ে থাকতি পা নে, আজ তিন দিন ঘরে চাল নেই।

গঙ্গাচরণ বললে—আমার ঘরে আজ দু'দিন চাল নেই।

আর একজন বললে—আমাদের দু'দিন ভাত খাওয়া হয় নি।

নবীন পাড়ুই বললে—কি খেলে ?

—কি আর খাবো ? ভাগ্যিস মাগীনরা দুটো চিঁড়ে কুটে রেখেছিল সেই বোশেখ মাসে তাই দুটো করে খাওয়া হচ্ছে। ছেলেপিলে তো আর শোনবে না, তারা ভরপেট খায়, আমর খাই আধপেটা।

—তা চিঁড়ের সেরও দেখতি দেখতি হয়ে গেল বারো আনা, যা ছিল দু'আনা।

—এ কি বিশ্বেস করতি পারা যায় ? কখনো কেউ দেখেচে না শুনেচে যে চিঁড়ের সের বারো আনা হবে ?

গঙ্গাচরণ বললে—কখনো কি কেউ শুনেচে যে চালের মণ ষোল টাকা হবে ?

নবীন পাড়ুই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে রইল। সে জোয়ান মানুষ যদিও তার বয়েস ঠেকেচে পঞ্চাশের কোঠায় ; যেমন বুকের ছাতি, তেমনি বাহুর পেশী। ভূতের মত পরিশ্র করেও যদি আধপেটা খেয়ে থাকতে হয়, তবে আর বেঁচে সুখ কি ? আজ দু-তিন দি তাই জুটেচে ওর ভাগ্যে।

এমন সময় দেখা গেল আকাইপুরের মাঠের পথ বেয়ে তিন-চারটি স্ত্রীলোক চালের ধাম কেউ বা বস্তা মাথায় বড় রাস্তায় এসে উঠলো।

সবাই এগিয়ে চললো অমনি।

মুহূর্তমধ্যে উপস্থিত পাঁচ-ছ'জনের মধ্যে একটা হুড়োহুড়ি কাড়াকাড়ি পড়ে গেল, কতটা চাল কিনতে পারে ! হঠাৎ ওদের মধ্যে কার যেন মনে পড়লো কথাটা, সে জিগে করলে—কত করে পালি ?

একজন চালওয়ালী বললে—পাঁচ সিকে।

গঙ্গাচরণ এবং উপস্থিত সকলেই আশ্চর্য হয়ে গেল, পাঁচ সিকে পালি, অর্থাৎ কুড়ি টাকা মণ!

নবীন পাড়ুইয়ের মুখ শুকিয়ে গেল, সে একটা টাকা এনেচে—পাঁচ সিকে না হোলে এক কাঠা চাল কেউ বিক্রি করবে না। এক টাকার চাল কেউ দেবে না।

এরা সকলেই আশ্চর্য হয়ে গেলেও দেখলে যে চাল যদি সংগ্রহ করতে হয় তবে এই বেলা। বিলম্বে হতাশ হতে হবে। আরও পাঁচ-ছ'জন ক্রেতাকে দূরে আসতে দেখা যাচ্চে।

দু'জন লোক এদের মধ্যে নিরুপায়। ওদের হাতে বেশি পয়সা নেই। সুতরাং চাল কিনবার আশা ওদের ছাড়তে হোল। এই দলে নবীন পাড়ুই পড়ে গেল।

গঙ্গাচরণ বললে—নবীন, চাল নেবে না?

—না বাবাঠাকুর, একটা সিকি কম পড়ে গেল।

—তবে তো মুশকিল। আমার কাছেও নেই যে তোমাকে দেবো।

—আধসের পুঁটিমাছ ধরেলাম সামটার বিলে। পেয়েলাম ছ'আনা। আর কাল মাছ বেচবার দরুণ ছেল দশ আনা। কুড়িয়ে-বুড়িয়ে একটা টাকা এনেলাম চাল কিনতি। তা আবার চালের দাম চড়ে গেল কি করে জানবো?

—তাই তো!

—আধপেটা খেয়ে আছি দু'দিন। চাষীদের ঘরে ভাত আছে, আমাদের তা নেই। আমাদের কষ্ট সকলের অপেক্ষা বেশি। জলের প্রাণী, তার ওপর তো জোর নেই? ধরা না দিলে কি করচি। যেদিন পালাম সেদিন চাল আনলাম, যেদিন পালাম না সেদিন উপোস। আগে ধান চাল ধার দিতো, আজকাল কেউ কিছু দেয় না।

গঙ্গাচরণ কাঠাদুই চাল সংগ্রহ করেছিল কাড়াকাড়ি করে। তার ইচ্ছে হোল একবার এই চাল থেকে নবীন পাড়ুইকে সে কিছু দেয়। কিন্তু তা কি করে দেওয়া যায়, চালের অভাবে হয়তো উপোস করে থাকতে হবে কালই। গ্রামে ধান চাল মেলে না যে তা নয়, মেলে অতি কষ্টে। ধান চাল থাকলেও লোকে স্বীকার করতে চায় না সহজে।

নবীন পাড়ুইকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গাচরণ রাধিকানগরের বাজারে এল। এক টাকার চালই কিনে দেবে তাকে। দোকান ছাড়া তো হবে না। কিন্তু মুশকিলের ব্যাপার, বড় বড় তিন-চারিটি দোকান খুঁজে বেড়ালে, সকলেরই এক বুলি—চাল নেই।

গঙ্গাচরণের মনে পড়লো বৃদ্ধ কুণ্ডু মশায়ের কথা। এই গত বৈশাখ মাসেও কুণ্ডু মশায়ের দোকানের সামনে দিয়ে যাচ্চে সে, কুণ্ডু মশাই তাকে ডেকে আদর করে তামাক সেজে খাইয়ে বলেচে—পণ্ডিত মশাই, আমার দোকান থেকে চাল নেবেন, ভাল চাল আনিয়েচি। কত খাতির করেচে।

কুণ্ডু মশায়ের দোকানে গেলে ফিরতে হবে না, ঠিক পাওয়া যাবেই। কিন্তু সেখানেও তথৈবচ, গঙ্গাচরণ দোকানঘরটিতে ঢুকবার সময় চেয়ে দেখলে বাঁ পাশের যে বাঁশের মাচায় চালের বস্তা ছাদ পর্যন্ত সাজানো থাকে, সে জায়গা একদম খালি, হাওয়া খেলচে।

বৃদ্ধ কুণ্ডু মশায় প্রণাম করে বললে—আসুন, কি মনে করে?

অভ্যর্থনার মধ্যে বৈশাখ মাসের আন্তরিকতা নেই যেন। প্রণামটা নিতান্ত দায়সারা গোছের।

গঙ্গাচরণ বললে—কিছু চাল দিতে হবে।

—কোথায় পাবো, নেই।

এক টাকার চাল, বেশি নয়। এই লোকটাকে উপোস করে থাকতে হবে। দিতেই হবে আপনাকে।

কুণ্ডু মশায় সুর নিচু করে বললে—সন্ধ্যের পর আমার বাড়ীতে যেতে বলবেন, খাবার চাল থেকে এক টাকার চাল দিয়ে দেবো এখন।

গঙ্গাচরণ বললে—ধান চাল কোথায় গেল? আপনার এত বড় দোকানের মাচা একদম ফাঁকা কেন?

—কি করবো বাপু, সেদিন পাঁচু কুণ্ডুর দোকান লুঠ হবার পর কি করে সাহস করে মাল রাখি এখানে বলুন! সবারই সে দশা। তার ওপর শুনচি পুলিসে নিয়ে যাবে চাল কম দামে মিলিটারির জন্যে।

—কে বললে?

—বলচে সবাই। গুজব উঠেচে বাজারে। আপনার কাছে মিথ্যে বলবো না, চাল আমি বাড়ী নিয়ে গিয়ে রেখে দিইচি। কিন্তু লোকের কাছে কবুল যাবো না, আপনাকে তাই বললাম, অন্যকে কি বলি?

—আমরা না খেয়ে মরবো?

—যদিন থাকবে, দেবো। তবে আমার জামাই গরুরগাড়ী করে বাঁশবাটির হাটে কিছু চাল নিয়ে যেতে চাইচে। তাই ভাবচি।

—পাঠাবেন না, লুঠ হবে পথে। বুঝে কাজ করুন, কিছু চাল দেশে থাকুক, নইলে দুর্ভিক্ষ হবে যে। কি খেয়ে বাঁচবে মানুষ?

—বুঝি সব, কিন্তু আমি একা রাখলি তো হবে না। খাঁ বাবুরা এত বড় আড়তদার, সব ধান বেচে দিয়েচে গবর্ণমেণ্টের কনট্রাকটারদের কাছে। এক দানা ধান রাখে নি। এই রকম অনেকেই করেচে খবর নিয়ে দেখুন। আমি তো চুনোপুঁটি দোকানদার, পঞ্চাশ-ষাট মণ মাল আমার বিদ্যে।

গঙ্গাচরণ সন্ধ্যার অন্ধকারে চিন্তান্বিত মনে বাড়ীর পথে চললো।

নবীন পাড়ুই সঙ্গেই ছিল, তাকে যেতে হবে দোমোহানী, নতুন গাঁয়ের পাশেই। বললে—পণ্ডিত মশাই ছেলেন তাই আজ বাচকাচের মুখে দু'টো দানা পড়বে। মোদের কথা ওসব বড় দোকানদার কি শোনে! মোরা হলাম টিকির মানুষ। কাল দু'টো মাছ পেটিয়ে দেবো আনে।

গঙ্গাচরণ বাড়ী নেই, পাঠশালায় গিয়েচে পড়াতে। হাবু ও পটল বাপের সংগে পাঠশালায়। একা অনংগ-বৌ রয়েছে বাড়ীতে। কে এসে ডাক দিলে—ও পণ্ডিত মশাই—বাড়ীতে আছ গা—

অনঙ্গ-বৌ কারো সামনে বড় একটা বার হয় না। বৃদ্ধ ব্যক্তি ডাকাডাকি করচে দেখে দোরের কাছে এসে মৃদুস্বরে বললে—উনি বাড়ী নেই। পাঠশালায় গিয়েচেন—

—কে? মা-লক্ষ্মী?

অনঙ্গ সলজ্জ ভাবে চুপ করে রইল।

বৃদ্ধটি দাওয়ায় উঠে বসে বললে—আ মায় একটু খাবার জল দিতি পারবা মা-লক্ষ্মী?

অনঙ্গ তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ঢুকে এক ঘটি জল নিয়ে এসে রাখলে। তারপর বাড়ীর গামছাখানা বেশ করে ধুয়ে ঘটির ওপর রেখে দিলে। একটু আখের গুড় ও এক গ্লাস জলও নিয়ে এল।

বললে—দু'কোষ কাঁটাল দেবো ?

—খাজা না রসা ?

—আধখাজা। এখন শ্রাবণ মাসে রসা কাঁটাল বড় একটা থাকে না।

—দাও, নিয়ে এসো—মা, একটা কথা—

—কি বলুন ?

—আমি এখানে দু'টো খাবো। আমি ব্রাহ্মণ। আমার নাম দীনবন্ধু ভট্টাচার্য। বাড়ী কামদেবপুরের সন্নিকট বাগান-গাঁ।

অনঙ্গ-বৌ বললে—খাবেন বই কি। বেশ, একটু জিরিয়ে নিন। ঠাঁই করে দি—

একটু পরে দীনু ভট্‌চাজ মোটা আউশ চালের রাঙা রাঙা ভাত, ঢেঁড়সভাজা, বেগুন ও শাকের ডাঁটাচচ্চড়ি দিয়ে অত্যন্ত তৃপ্তির সঙ্গে খাচ্ছিল। অনঙ্গ-বৌ বিনীতভাবে সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

দীনু খেতে খেতে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে যেন একটু দম নিলে। তার পর বললে—মা-লক্ষ্মীর রান্না যেন অমৃত। চচ্চড়ি আর একটু দাও তো ?

অনঙ্গ লজ্জা কুণ্ঠিত স্বরে বললে—আর তো নেই ! ঢেঁড়সভাজা দুখানা দেবো ?

—তাই দাও মা।

এত বৃদ্ধ লোক যে এতগুলো ভাত এক নিঃশ্বাসে খেয়ে ফেলতে পারে, অনঙ্গ-বৌ নিজের চোখে না দেখলে তা বিশ্বাস করতো না। বললে—আর ভাত দেবো ?

—তা দুটো দাও মা।

—মুশকিল হয়েচে, খাবেন কি দিয়ে ! তরকারি বাড়ন্ত।

—তেঁতুল এক গাঁট দিতি পারবা ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আমরা হোলাম গিয়ে গরীব মানুষ। সব দিন কি মাছ-তরকারী জোটে ? কোনো দিন হোল না, তেঁতুল এক গাঁট দিয়ে এক পাতর ভাত মেরে দেলাম—

অনঙ্গের ভাল লাগছিল এই পিতার বয়সী সরল বৃদ্ধের কথাবার্তা। ইনি বোধ হয় খুব ক্ষুধার্ত ছিলেন। বলতে নেই, কি রকম গোগ্রাসে ভাত কটা খেয়ে ফেললেন। আরও থাকলে আরও খেতে পারতেন বোধ হয়। কিন্তু বড্ড দুঃখের বিষয়, ভাত-তরকারি আর ছিল না। খাওয়া-দাওয়ার পর অনঙ্গ বললে—তামাক সেজে দেবো ?

—তোমাকে দিয়ে তামাক সাজাবো মা-লক্ষ্মী ? না—না—কোথায় তামাক বলো। আমি নিজে বলে তামাক সাজতি সাজতি বুড়ো হয়ে গেলাম। ঊনসত্তর বছর বয়েস হোল।

—ঊনসত্তর ?

—হ্যাঁ। এই আশ্বিন মাসে সত্তর পোরবে। তোমরা তো আমার নাতনীর বয়সী।

দীনু ভট্‌চায হ্যা-হ্যা করে হেসে উঠলো কথার শেষে।

অনঙ্গ-বৌ নিজেই তামাক সেজে কল্কেয় ফুঁ দিতে দিতে এল, ওর গাল দুটি ফুলে উঠেচে, আগুনের আভায় রাঙা হয়ে উঠেচে।

দীনু শশব্যস্তে বললেন—ওকি, ও কি,—এই দ্যাখো মা-লক্ষ্মীর কাণ্ড !

—তাতে কি ? এই তো বললেন—আমাকে নাতনীর সমবয়সী ।

—না না, ওটা ভালো না । মা-লক্ষ্মী তুমি কেন তামাক সাজবে ? ওটা আমি পছন্দ করি নে—দ্যাও হুঁকো আমার হাতে । ফুঁ দিতি হবে না ।

অনঙ্গ-বৌ একটা মাদুর ও বালিশ নিয়ে এসে পেতে দিয়ে বললে—গড়িয়ে নিন একটু ।

বেলা পাঁচটার সময় পাঠশালার ছুটি দিয়ে গঙ্গাচরণ বাড়ী ফিরে কে একজন অপরিচিত বৃদ্ধকে দাওয়ায় শুয়ে থাকতে দেখে কিছু বুঝতে পারলে না । পরে স্ত্রীর কাছে সব শুনে বললে—ও, কামদেবপুরের সেই বুড়ো ভট্চায ! চিনেচি এবার । কিন্তু তুমি তা হোলে না খেয়ে আছ ?

অনঙ্গ বললে—আহা, আমি তো যা-তা খেয়েই এক বেলা কাটাতে পারি । কিন্তু বুড়ো বামুন, ওর না-খাওয়ার কষ্টটা—

—সে তো বুঝলাম । কিন্তু যা-তা খেয়ে যে কাটাবে—যা-তা ঘরে ছিলই বা কি ?

—তোমার সে ভাবনা ভাবতে হবে না ।

স্ত্রীকে গঙ্গাচরণ খুব ভালো করেই জানে । ওর সঙ্গে মিছে তর্ক করে কোনো লাভ নেই । মুখের ভাত অপরকে ধরে দিতে ও চিরকাল অভ্যস্ত । অথচ মুখ ফুটে বলবে না কখনো কি খেয়েচে না খেয়েচে । এমন স্ত্রী নিয়ে সংসার করা বড় মুশকিলের কাণ্ড । কত কষ্টে গত হাটে চাল যোগাড় করেছিল সে-ই জানে ।

ইতিমধ্যে দীনু ভট্চায ঘুম ভেঙে উঠে বসলো । বললে—এই যে পণ্ডিত মশাই !

গঙ্গাচরণ দু' হাত জুড়ে নমস্কার করে বললে—নমস্কার । ভাল ?

দীনু হেসে বললে—মা-লক্ষ্মীর হাতে অন্ন খেয়ে আপাতোক খুবই ভালো । বড্ড জমিয়ে নিয়েচি ! মা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী !

গঙ্গাচরণ মনে মনে বললে—ওর মাথাটি খেলে কেউ লক্ষ্মী, কেউ অন্নপূর্ণা বলে । আমি এখন মাঝে পড়ে মারা যাই ।

মুখে বললে—হেঁ হেঁ, তা বেশ—তা আর কি—

—কোথা থেকে ফিরলেন ?

—পাঠশালা থেকে ।

—আমি একটু বিপদে পড়ে পরামর্শ করতে এলাম পণ্ডিত মশায় ।

—কি বলুন ?

—বলবো কি, বলতি লজ্জা হয় । চাল অভাবে সপুরী উপোস করতে হচ্চে । কম দুঃখে পড়ে আপনার কাছে আসি নি ।

—কামদেবপুরে মিলচে না ?

—আমাদের ওদিকি কোনো গাঁয়ে না । আর যদিও থাকে তো দেড় টাকা করে কাঠা বলচে । এ কি হোল দেশে ? আমার বাড়ী চার-পাঁচজন পুষ্যি । দেড় টাকা চালের কাঠা কিনে খাওয়াতে পারি আমি ?

—এদিকেও তো ওই রকম ভট্চায মশায় । আমাদের গাঁয়েও তাই ।

—বলেন কি ?

—ঠিক তাই। ও হাটে অতি কষ্টে দু'কাঠা চাল কিনে এনেছিলাম।

—ধান ?

—ধান কেউ বিক্রি করচে না। করলেও ন' টাকা সাড়ে ন' টাকা মণ।

—এর উপায় কি হবে পণ্ডিত মশায় ? আপনি বসুন, সেই পরামর্শ করতি তো আমার আসা। সত্যি কথা বলতি কি আপনার কাছে, কাল রাতি আমার খাওয়া হয় নি। চাল ছিল না ঘরে। মা-লক্ষ্মীর কাছে অন্ন খেয়ে বাঁচলাম। বুড়ো বয়সে খিদের কষ্ট সহ্য করতে পারি নে আর।

—কি বলি বলুন, শুনে বড্ড কষ্ট হোল। করবারও তো নেই কিছু। আমাদের গ্রামের অবস্থাও তথৈবচ।

দীনু ভট্চায দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—বুড়ো বয়সে এবারডা না খেয়ে মরতি হবে দেখচি।

গঙ্গাচরণ বললে—তাই তো পণ্ডিত মশাই, কি যে করি, বুঝতে তো কিছু পারি নে। তা ছাড়া আপনাদের গাঁয়ের ব্যবস্থা এখান থেকে কি করে করা যাবে ! কতটা চাল চান ? চলুন দিকি একবার বিশ্বেস মশায়ের বাড়ী !

কিন্তু বিশ্বাস মশায়ের বাড়ী যাওয়া হবে কি, দীনু ভট্চায ম্লানমুখে বললে—তাই তো, পয়সাকড়ি তো আনি নি।

গঙ্গাচরণ একটু বিরক্তির সুরে বললে—আনেন নি, তবে আর কি হবে ? কি করতে পারি আমি ?

গঙ্গাচরণ বোধ হয় একটু কড়া সুরে বলে ফেলেছিল কথাটা।

দীনু ভট্চায হতাশভাবে বললে—তাই তো, এবারডা দেখচি সত্যিই না খেয়ে মরতি হবে।

গঙ্গাচরণ ভাবলে—ভাল মুশকিল ! তুমি না খেয়ে মরবে তা আমি কি করবো ? আমার কি দোষ ?

এই সময় অনঙ্গ-বৌ দোরের আড়াল থেকে হাতনাড়া দিয়ে গঙ্গাচরণকে ডাকলে।

গঙ্গাচরণ ঘরের মধ্যে গিয়ে বললে—কি বলচ ?

—জিজ্ঞেস করো উনি কি এখন দুখানা পাকা কাঁকুড় খাবেন ? ঘরে আর তো কিছু নেই।

—থাকে তো দাও না। জিজ্ঞেস করতে হবে না। ফুটি কাঁকুড় কি দিয়ে দেবে ? গুড় বা চিনি কিছুই তো নেই।

—সে ব্যবস্থার জন্যে তোমার ভাবতে হবে না। সে আমি দেখচি। আর একটা কথা শোনো। উনি অমন দুঃখু করচেন বুড়ো বয়েসে না খেয়ে মরবেন বলে, তোমাকে একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। আমাদের বাড়ী এয়েচেন কেন, একটা হিল্লে হবে বলেই তো। আমি দুটো কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে ঘর করি। বুড়ো বামুন আমাদের বাড়ী থেকে শুধু হাতে শুধু মুখে ফিরে গেলে অকল্যাণ হবে না ! তা ছাড়া যখন আমাদের আশা করে এতটা পথ উনি এয়েচেন, এর একটা উপায় না করলে হয় ?

গঙ্গাচরণ বিরক্ত মুখে বললে—কি উপায় হবে ? খালি হাতে এসেচে বুড়ো ! ও বড্ড ধড়িবাজ। একদিন অমনি কামদেবপুর থেকে ফিরবার পথে চালগুলো নিয়ে নিলে—

অনঙ্গ-বৌ জিভ কেটে বললে—ছিঃ ছিঃ—অতিথি নারায়ণ। আমার বাড়ী উনি এয়েচেন, আমাদের কত ভাগ্যি? ও কথাটি বোলো না। অতিথিকে অমন কথা বলতে আছে? কাকে কি যে বলো। নিয়েচেন চাল, নিয়েচেন। আমাদের বাপের বয়সী মানুষ। ওঁকে অমন বোলো না—

—তা তো বুঝলাম, বলবো না! কিন্তু পয়সা না থাকলে চাল ধান পাবো কোথায়?

—উনি কি বলেন দ্যাখো—

—উনি যা বলবেন বোঝাই গিয়েচে। উনি এয়েচেন ভিক্ষে করতে, সোজা কথা। মেগে পেতে বেড়ানোই ওঁর স্বভাব।

অনঙ্গ-বৌ ধমক দিয়ে বললে—আবার ওই সব কথা?

—তা আমি কি করব এখন? বলো তাই করি।

—শুধু হাতে উনি না ফেরেন। বাপের বয়সী বামুন। না হয় আমার হাতের পৈটি বাঁধা দিয়ে দুটো টাকা এনে ওঁকে চাল কিনে দাও। দিতেই হবে, না দিলে আমি মাথা খুঁড়ে মরবো। চাল তো আমাদেরও কিনতে হবে। রাতে রান্না হবে না।

গঙ্গাচরণ বাড়ীর বাইরে যাচ্ছিল, অনঙ্গ-বৌ বললে—পাকা কাঁকুড় দুখানা খেয়ে যাও। বেরিও না।

গঙ্গাচরণ বিরক্তির সুরে বললে—আমি বিনি মিষ্টিতে ফুটি কাঁকুড় খেতে পারি নে। ওসব বাঙালে খাওয়া তোমরা খাও।

অনঙ্গ-বৌ সকৌতুক হাসি হাসি চোখ নাচিয়ে বললে—বাঙাল বাঙাল করো না বলচি, ভাল হবে না! আমি বাঙাল, আর উনি এসেচেন একেবারে মুকসুদোবাদ জেলা থেকে—

—সে আবার কি গো? ও কথা তুমি আবার কোথায় শিখলে?

—শিখতে হয় গো, শিখতে হয়। সেই যে ভাতছালায় উত্তুরে ঘরামি জন ঘর ছাইতে আসতো, মনে পড়ে? ওরা বলতো না, মা, আমাদের বাড়ী মুকসুদোবাদ জেলা—হি-হি-হি—

একটু পরে বাইরের দাওয়ায় বসে দীনু ও গঙ্গাচরণ দু'জনেই পাকা ফুটি কাঁকুড় খাচ্ছিল খেজুরগুড়ের সঙ্গে। কোথায় অনঙ্গ-বৌ একটু খেজুরগুড় লুকিয়ে সঞ্চয় করে রেখেছিল সময় অসময়ের জন্যে। অনঙ্গ-বৌ ওই রকম রেখে থাকে। গঙ্গাচরণ জানে, অনেক সময় জিনিসপত্র ভেল্কিবাজির মত বার করে অনঙ্গ।

দীনু ভট্চায কাঁসার বাটী থেকে গুড়টুকু চেটেপুটে খেয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—আহা, খেজুরগুড়ের মুখ এবার আর দেখি নি।

গঙ্গাচরণ বললে—তা বটে।

—আগে আগে পণ্ডিত মশায়, গুড় আমাদের কিনতি হোত না। মুচিপাড়ায় বানে খেজুর রস জাল দিতো, ঘটি হাতে করে গিয়ে দাঁড়ালি আধ সের এক সের গুড় এমনি খেতি দিতো। সে সব দিন কোথায় যে গেল!

গঙ্গাচরণ বাড়ী থেকে বার হয়ে গেলেই অনঙ্গ-বৌ দাওয়ায় এসে দাঁড়িয়ে বললে—কাঁকুড় কেমন খেলেন?

—চমৎকার মা চমৎকার। তুমি সাক্ষাৎ মা-লক্ষ্মী, কি আর বলবো তোমায়। একটা কথা বলবো?

—কি বলুন না ?

—মা একটু চা করে দিতি পারো ?

অনঙ্গ-বৌ বিপন্ন মুখে বললে—চা ?

—কতদিন চা খাই নি। মাসখানেক আগে সবাইপুরের গাঙ্গুলীবাড়ী গিয়ে একদিন চা খেয়েছিলাম। চা আমার বড্ড খেতি ভাল লাগে। আগে আগে বড্ড খ্যাতাম। এদানি হাতে পয়সা অনটন, ভাতই জোটে না বলে চা! আছে কি ?

অনঙ্গ-বৌ ভেবে বললে—আচ্ছা, আপনি বসুন—

হাবুকে বাড়ীর মধ্যে গিয়ে বললে—হ্যাঁরে, কাপাসীর মা'র বাড়ী ছুটে যা তো। আমার নাম করে বলগে, একটু চা দাও। যদি সেখানে না থাকে, তবে শিবু ঘোষদের বাড়ী যাবি। চা আনিতি হবে বাবা।

হাবু বললে—ও বুড়ো কে মা ?

—যাঃ, বুড়ো বুড়ো কি রে ? ও রকম বলতে আছে ? বাড়ীতে নোক এলে তাকে মেনে চলতে হয়, শিখে রাখো।

—হ্যাঁ মা, চা কি দিয়ে হবে ? চিনি নেই যে—

—তোর সে ভাবনায় দরকার কি ? তুই যা বাপু, চা একটু এনে দে—

আধঘণ্টা পরে প্রফুল্লবদনে দীনু ভট্চাযের সামনে হাসি হাসি মুখে চায়ের গ্লাস স্থাপন করে অনঙ্গ-বৌ বললে—দেখুন তো কেমন হয়েচে ? সত্যি কথা, চায়ের পাটাপাট তেমন তো নেই এ বাড়ীতে। কেমন চা করলাম কে জানে ?

দীনু ভট্চায চা-পূর্ণ কাঁসার গ্লাস কোঁচার কাপড়ে জড়িয়ে দু-হাতে ধরে এক চুমুক দিয়ে চোখ বুজে বললে—বাঃ, বেশ বেশ মা-লক্ষ্মী—এই আমার অমর্তো। দিব্যি হয়েচে—

এই সময় গঙ্গাচরণ বাড়ী ফিরে স্ত্রীকে বললে—চলো, ওদিকে একটা কথা শোনো।

অনঙ্গ-বৌ আড়ালে এসে নিচু সুরে বললে—কি ?

—চাল আনলাম এক কাঠা বিশ্বেস মশায়ের বাড়ী থেকে চেয়ে-চিন্তে। আর ধারে তিন কাঠা ধানের ব্যবস্থা করে এলাম। দীনু ভট্চাযকে কাল সকালে এনে দেবো। আজ আর বুড়ো নড়চে না দেখচি। ও খাচ্চে কি ? চা নাকি ? কোথায় পেলে ? বুড়ো আছে দেখচি ভালোই। আর কি নড়ে এখান থেকে ?

—তোমার অত সন্ধানে দরকার কি ? তুমি একটু চা খাবে ? দিচ্চি। আর ওঁকে অমন বোলো না। বলতে নেই। বুড়ো বামুন অতিথি—ছিঃ—

গঙ্গাচরণ মুখবিকৃতি করে অতিথির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলে। মুখে বললে—ওঃ, ভারি আমার অতিথি রে!

ধমক দিয়ে অনঙ্গ-বৌ বললে—ফের ? আবার ?

বিশ্বাস মশায়ের বাড়ী একদিন গঙ্গাচরণ গিয়ে দেখলে গ্রামের অনেকগুলি লোক জুটেচে। ঘন ঘন তামাক চলচে।

হীরু কাপালী বলচে—আমাদের কিছু ধান দ্যান বিশ্বেস মশাই, নয়তো আমরা না খেয়ে মলাম।

সঙ্গে সঙ্গে আরও পাঁচ-ছ'জন লোক ওই এক কথাই বললে। ধান দিতে হবে, না দিলে তাদের পরিবারে অনাহার শুরু হবে।

বিশ্বাস মশাই বললেন—নিয়ে যাও গোলা থেকে। যা আছে, দু-পাঁচ আড়ি করে এক এক জনের হবে এখন। যতক্ষণ আমার আছে, ততক্ষণ তোমাদের দিয়ে তো যাই, তারপর যা হয়।

গঙ্গাচরণও ধানের জন্যে দরবার করতে গিয়েছিল। তাকে বিশ্বেস মশায় বললেন—আপনি ব্রাহ্মণ মানুষ। আপনাকে কর্জ হিসেবে ধান আর কি দেবো! পাঁচ আড়ি ধান নিয়ে যান। কিন্তু এই শেষ, আর আমার গোলায় ধান নেই।

গঙ্গাচরণ বিস্মিত হোল বিশ্বাস মশায়ের কথায়। যার গোলাভর্তি ধান, মাত্র এই কয় জন লোককে সামান্য কিছু ধান দিয়ে তার গোলা একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাবে, এ কেমন কথা হোল?

পথে তাকে হীরু কাপালী গোপনে বললে—বিশ্বেস মশায় ধান সব লুকিয়ে সরিয়ে ফেলে দিয়েচে পণ্ডিত মশাই। পাছে মোদের দিতি হয় সেই ভয়ে। দু' পৌটি ধান ধরে হাতীর মত গোলা—ধান নেই কি রকম?

—তোমরা তো ধান নিলে, কি রকম দেখলে গোলায়?

—গোলা সাবাড় পণ্ডিত মশাই, নিজের চোকে দেকি এলাম। এক দানা নেই ওর মধ্যি

—তাই তো!

—এবার এই ধান কটা ফুরুলি না খেয়ে মরতি হবে—

—কেন, ভাদ্র মাসের দশ-বারো তারিখের মধ্যে আউশ ধান পেকে উঠচে। ভাবনা চলে যাবে তখন।

—তা কি হয় পণ্ডিত মশাই? নতুন ধানের চাল খেলি সদ্য কলেরা। দেখবেন তাই লোকে খাবে পেটের জ্বালায় আর পট্ পট্ মরবে। ও চাল কি এখন খাওয়া যাবে—না পেটে সহ্য হবে? ও খেতি পারা যাবে কার্তিক-অঘ্রাণ মাসের দিকি।

—তবে উপায় কি হবে লোকের?

—এবার যে রকমডা দেখছি, না খেয়ে লোক মরবে।

কথাটা গঙ্গাচরণের বিশ্বাস হোল না। না খেয়ে আবার লোক মরে? কখনো দেখা যায় নি কেউ না খেয়ে মরেচে। জুটে যায়ই কোনো-না-কোনো উপায়ে। যে দেশে এত খাবার জিনিস, সে দেশে লোকে না খেয়ে মরবে?

অনঙ্গ-বৌ বললে—ও কটা ধান আমি নিজেই ভেনে কুটে নেবো ঢেঁকিতে। ওর জন্যে আর কারো খোশামোদ করতে হবে না। কিন্তু ওতে কদিন চলবে?

—তাই তো আমিও ভাবচি।

—আমি একটা কথা ভাবচি। অন্য লোকের চাল কেন আমি ভেনে দেই না? বানি পাবো দু'কাঠা করে চাল মণে।

—ছিঃ ছিঃ, দু'কাঠা চাল বানি দেবে তার জন্যে তুমি দশ আড়ি ধান ভানতে যাবে? অত কষ্ট করে দরকার নেই।

—কষ্ট আর কি? দু'কাঠা চালের দাম কত আজকাল! আমি তা ছাড়বো না। দু'কাঠা চাল বুঝি ফেলনা!

—লোকে কি বলবে বল তো ?

—বলুক গে। আমার সংসারে যদি দু'কাঠা চালের সাশ্রয় হয় তবে লোকের কথাতে কি যাসে যাচ্চে ?

—তুমি যা ভাল বোঝো কর, কিন্তু আমার মনে হচ্চে তোমার শরীর টিকবে না।

—সে তোমায় দেখতে হবে না।

তারপর অনঙ্গ-বৌ হঠাৎ খিল খিল করে হেসে উঠে ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে বললে—তোমায় ঠকিয়েচি গো তোমায় ঠকিয়েচি।

গঙ্গাচরণ বিস্ময়ের সুরে বললে—কি ঠকিয়েচ ?

—ঠকিয়েচি মানে চোখে ধুলো দিইচি।

—কেন ?

—কত দিন আগে থেকে আমি ধান ভানচি।

—সত্যি ?

—সত্যি গো সত্যি। নইলে চালের হিসেব নিয়ে দেখো। দু' কাঠা চাল তো হাট থেকে কিনেছিলে। কত দিন খেলে মনে নেই ?

—আমায় না জানিয়ে কেন অমন করচো তুমি ? ছিঃ ছিঃ—কাদের ধান ভানো ?

—হরি কাপালীদের। শ্যাম বিশ্বেসদের।

—ক'কাঠা চালের জন্যে কেন কষ্ট করা ? ওতে মান থাকে না। ব্রাহ্মণের মেয়ে হয়ে কাপালীদের ধান ভানা ? লোকে জানলে কি বলবে বল তো ? এত ছোট নজর তোমার হোল কেমন করে তাই ভাবচি।

—বেশ, লোকে আমায় বলে বলবে, আমার ছেলেপুলে তো দু' মুঠো পেট ভরে খেতে পাবে। তা ছাড়া কাপালীদের দুই বৌ ধান এলে দেয়। আমি শুধু ঢেঁকিতে পাড় দিই।

—তুমি ধান এলে দিতে পারো ? এলে দেওয়া বড্ড শক্ত না ?

—এলে দেওয়া শিখতে হয়। তাড়াতাড়ি গড় থেকে যে হাত উঠিয়ে নিতে পারে সে ভাল এলে দিতে পারে। এলে দেওয়ানো শিখচি একটু একটু।

গঙ্গাচরণ স্ত্রীর কথায় ভাবনায় পড়ে গেল। তার স্ত্রী যে তাকে লুকিয়ে এ কাজ করচে তা সে জানতো না। মাঝে মাঝে সে ভেবেচে অবিশ্যি, মাত্র দু' কাঠা এক কাঠা চালে তার এক হাট থেকে আর এক হাট পর্যন্ত চলচে কি করে ? এতদিন লুকিয়ে লুকিয়ে অনঙ্গ-বৌ চালাচ্চে তা তো সে জানতো না !

আহা, বেচারী ! যদি ধান এলে দিতে গিয়ে কোনদিন ওর আঙুলে ঢেঁকি পড়ে যায় ?

গঙ্গাচরণ পাঠশালায় বেরিয়ে গেলে হরি কাপালীর ছোট বৌ এসে ছেঁচতলায় দাঁড়িয়ে চুপি চুপি বললে—উনি চলে গিয়েচেন ?

—হ্যাঁ, দিদি। যাই—

—চলো বামুন-বৌ, ওরা সব বসে আছে তোমার জন্যি।

—কত ধান আজকে ?

—পাঁচ আড়ি তিন কাঠা। চিঁড়ে আছে তিন কাঠা।

—আমাকে ধান এলে দেওয়া শিখিয়ে দিবি দিদি ?

—সে তোমার কাজ নয়। অমন চাঁপাফুলের কলির মত আঙুল, ঢেঁকি পড়ে ছেঁচে যাবে। তার দায়িক আমি হবো বুঝি বামুন-বৌ ?

—দায়িক হতে হবে না সেজন্যি। আহা, ভঙ্গি দেখো না ! মরণের ভগ্নদশা !

কাপালী-বৌ অনঙ্গ-বৌয়ের দিকে চোখ মিটকি মারছিল, তার প্রতি লক্ষ্য করেই অনঙ্গ-বৌয়ের শেষের উক্তিটুকু। হরি কাপালীর ছোট বৌয়ের বয়েস অনঙ্গ অপেক্ষা বছর দুই বেশি হবে, ছেলেপুলে হয় নি, রংও ফর্সা, মুখ-চোখের চটক ও দেহের গড়ন এবং বাঁধুনি ভালোই। রাস্তার লোকে চেয়ে দেখে।

অনঙ্গ হেসে বললে—আড়চোখ দেখাগে অন্য জায়গায়—বহুলোকের মুন্ডু ঘুরিয়ে দিতে পারবি।

কাপালী-বৌ হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কি। বললে—মুন্ডু ঘুরিয়ে বেড়ানো বুঝি আমার কাজ ?

—কি জানি দিদি ?

—আর তুমি বামুন-বৌ—তুমি যে অনেক মুনির মন টলিয়ে দিতে পারো মন করলি ? আমরা তো তোমার পায়ের নখের যুগ্যি নই। সামনে খোশামোদ করে বলচি নে বামুন-বৌ। গ্রামের সবাই বলে—

অনঙ্গ-বৌ সলজ্জ হাসি মুখে বললে—যাঃ—

হরি কাপালীর দু'খানা মেটে ঘর, একদিকে পুঁইমাচা, একদিকে বেড়ার মধ্যে লালডাঁটা ঝিঙে ও বেগুনের চাষ। পুঁইমাচার পাশে ছোট চালার নিচে ঢেঁকি পাতা। সেখানে জড়ো হয়েচে হরি কাপালীর বড়-বৌ, আরও পাড়ার দু-তিনটি ঝি-বৌ। ঢেঁকিঘরের চারপাশে বর্ষাপুষ্ট বনকচুর ঝাড়, ধুতরো গাছ, আদাড় বাগ গাছে রাঙা রাঙা মটর ফল, ঢেঁকিঘরের চালে তেলাকুচো লতা উঠে দুলচে, বর্ষাসজল হাওয়ায় কচি লতাপাতার গন্ধ।

অনঙ্গ-বৌ আর ছোট-বৌ সেখানে পেঁছুতে সবাই খুব খুশি।

বড়-বৌ বললে—এসো বামুন-বৌ, তুমি না এলি ঢেঁকশেলের মজলিশ আমাদের জমে না—

ক্ষিস্তুরী কাপালী বললে—যা বললে দিদি, ঠাকরুণ-দিদি আমাদের ঢেঁকশেল আলো করে থাকেন। আমাদের বুকির মধ্যি হু-হু করতি থাকে উনি না এলি—

অনঙ্গ-বৌ হেসে বললে—তোমাদের বড্ড দরদ দেখছি—

ছোট-বৌ বললে—আমিও তা বলছিলাম, বামুন-বৌয়ের রাঙা পায়ের তলায় পড়ে আমি মরতি পারি—

বড়-বৌ বললে—সে তো ভাগ্যি—বামুনের এয়িস্ত্রী বৌয়ের পায়ে মরবার ভাগ্যি চাই রে ছুটকি। সে এমনি হয় না।

এদের দুপুরের মজলিশ জমে উঠলো।

কাপালীপাড়ার বৌ-ঝিয়েদের এই একমাত্র আমোদ-আহ্লাদের স্থান। এখানে না এলে ওদের দুপুরটা মিথ্যে হয়ে যায় যেন। পাড়াগাঁয়ের গৃহস্থঘরের মেয়ে, দুপুরে এদের দিবা-নিদ্রার অভ্যেস নেই, সময়ও পায় না। ধান ভানা চিঁড়ে কোটাতেই অবসর সময় কেটে যায়, ওর মধ্যেই এদের আড্ডা, গল্পগুজব যা কিছু।

অনঙ্গ-বৌ বললে—বড়-বৌ, ও ধান কাদের ?

—কাল উনি কোত্থেকে কত কষ্টে পাঁচ কাঠা ধান এনেলেন—কিন্তু শুনচি ধান নাকি সব গবরমেণ্ট নিয়ে যাচ্চে ?

—কে বললে ?

—উনি কাল হাট থেকে নাকি শুনে এয়েচেন।

ছোট-বৌ বললে—ওসব কথা এখন রাখো দিদি। বামুন-বৌয়ের জন্যে একটা পান সেজে নিয়ে এসো দিকি।

—পান আছে, সুপুরি নেই যে ? কাল হাটে একটা সুপুরির দাম দু'পয়সা।

সিদ্ধেশ্বর কামারের বৌ বললে—হ্যাঁ দিদি, নাকি আজকাল খেজুরের বীচি দিয়ে পান সাজা হচ্চে সুপুরির বদলে ?

অনঙ্গ-বৌ বললে—সত্যি ?

কামার-বৌ বললে—সত্যি মিথ্যে জানি নে ঠাকরুণ-দিদি। মিথ্যে কথা বলে শেষকালে বামুনের কাছে, নরকে পচে মরবো ? কানে যা শুনিচি—বললাম।

কথা শেষে সে হাতের এক রকম ভঙ্গি করে মৃদু হাসলো।

এই ঢেঁকিশালের মজলিশে অনঙ্গ-বৌয়ের পরে দেখতে ভালো হরি কাপালীর ছোট-বৌ, তার পরেই এই কামার-বৌ। এর বয়েস আরও কম ছোট-বৌয়ের চেয়ে, রংও আরও একটু ফর্সা—তবে ছোট-বৌয়ের মুখশ্রী এর চেয়ে ভালো। কামার-বৌ সম্বন্ধে গ্রামে একটু বদনাম আছে, সে অনেক ছেলে-ছোকরার মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেবার জন্যে দায়ী, অনেককে প্রশ্রয়ও দেয়। কিন্তু ছোট-বৌ সম্বন্ধে সে কথা কেউ বলতে পারে না। অনঙ্গ-বৌ বললে—পোড়া কপাল পান খাওয়ার। খেজুরের বীচি দিয়ে পান খেতে যাচ্চি নে।

ক্ষিত্তুরী কাপালী শুনে হেসে খুন হয় আর কি। সে বিনোদ মোড়লের বিধবা বোন, ছাব্বিশ-সাতাশ বছর বয়েস, আধফর্সা থান পরে এসেচে, দেখতে শুনতে নিতান্ত ভালও নয়, খুব মন্দও নয়। কথায় কথায় হেসে গড়িয়ে পড়া ওর একটা রোগের মধ্যে গণ্য।

অনঙ্গ-বৌয়ের হাসি পেল ক্ষিত্তুরীর হাসি দেখে।

হাসতে হাসতে বললে—নে বাপু থাম—তুই আবার জ্বালালি দেখচি—এত হাসিও তোর !

ছোট-বৌ ঠোঁট উল্টে বললে—ওই বোঝো।

ইতিমধ্যে বড়-বৌ কি ভাবে দুটো পান সেজে নিচু ঘরের দাওয়ার ধাপ থেকে নামলো।

ছোট-বৌ বললে—বিনি সুপুরিতে দিদি ?

বড়-বৌ ঝঙ্কার দিয়ে বলল—ওরে না না। খুঁজে পেতে ঘর থেকে উটকে বার করলাম।

—কোথায় ছিল ?

—তোকে বলবো কেন ?

—কেন ?

—তুই সব্বস্ব উটকে বের করবি। তোর জ্বালায় ঘরে কিছু থাকবার জো আছে ? আমি যাই গিন্নী, তাই সব জিনিস যোগাড় করে তুলে লুকিয়ে রেখে দি। আর তুই সব উটকে উটকে বার করিস।

ছোট-বৌ চোখ পাকিয়ে ভুরু তুলে বললে—আমি ?

—হ্যাঁ, তুই। আমি কাউকে ভয় করে কথা বলবো নাকি ? তুই ছাড়া আর কে ?

—তুমি দেখেচ দিদি ?

—দেখি নি, একশো দিন দেখিচি। বলি, ঘর বলতি দু'খানা বাতাসা রেখে দিইছিলাম, ওমা সেদিন দেখি নেই সেটুকু। তুই চুরি করে খেয়েচিস। কে ঘরে ঢুকতে গিয়েচে তুই ছাড়া ? ছেলেপিলের বালাই নেই যখন বাড়ীতে।

কথাটা বোধ হয় নিতান্ত মিথ্যে নয়, কারণ এই কথার পর ছোট-বৌয়ের কথার সুর ও তেজ কমে গেল। সে বললে—খেইচি যাও, বেশ করিচি। আমার জিনিস না ?

—বড্ড যে সত্ত্ব দেখাচ্ছিস লা !

অনঙ্গ-বৌ বললে—আহা, কি তুচ্ছ জিনিস নিয়ে দু'বেলা তোমাদের ঝগড়া। থামো না বাপু।

বড়-বৌ বললে—আমি অন্যায় কথাটি কি বলিচি বামুন-বৌ তুমিই বিচের কর। ঘর বলে জিনিস লুকিয়ে রাখি এই যুজ্যের বাজারে। তুই সেগুলো উটকে উটকে চুরি করে খাস কেন ?

অনঙ্গ-বৌ বললে—ও ছেলেমানুষ যে বড়-বৌ। তোমার মেয়ে হোলে আজ অত বড় মেয়েই হোত। হোত না ?

—আমার মেয়ের পোড়াকপাল !

—ওমা সে কি, পোড়াকপাল কি ! ছোট-বৌ দেখতে সুশ্রী কেমন ? চেয়ে দেখতে পাও না ? দু'চোখের কি মাথা খেয়েচ !

ছোট-বৌ হঠাৎ বড় নরম হয়ে গিয়েছিল। সে বললে—নাও নাও বামুন-বৌ, তোমার আদিখ্যেতা দেখে আর বাঁচিনে !

বড়-বৌ ছোট-বৌয়ের দিকে আড়চোখে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে মুখ চোখ ঘুরিয়ে হাত নেড়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে বললে—আহা-হা ! বলি কত ঢং দেখালি লা !

ক্ষিতুরী কাপালী বড়-বৌয়ের চোখ মুখ ঘোরানোর ভঙ্গি দেখে পুনরায় হেসে গড়িয়ে প্রায় ঢেঁকির গড়ের উপর উপুড় হয়ে পড়লো। মুখে অসংলগ্ন ভাবে যা বলতে লাগলো তা অনেকটা এই রকম—ওমা পোড়ানি—বড়-বৌ—হি হি—কি কাণ্ড—হি হি—বলে কিনা—ও বামুনদিদি—হি হি—আমি আর বাঁচবো না—ওমা—হি হি—ইত্যাদি।

কামার-বৌ বললে—তা নাও, তুমি আবার যে এক কাণ্ড বাধালে ! গড়ে কপাল ছেঁচে না যায় দেখো !

শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি অবস্থা দেখে অনঙ্গ-বৌ যে এত আশাবাদী, সে পর্যন্ত ভয় খেয়ে গেল। ধান চাল হঠাৎ যেন কর্পূরের মত দেশ থেকে উবে গেল কোথায় ! এক দানা চাল কোথাও পাওয়া যায় না। অত বড় গোবিন্দপুরের হাটে চাল আসে না আজকাল। খালি ধামা কাঠা হাতে দলে দলে লোক ফিরে যাচ্চে চাল অভাবে। হাহাকার পড়ে গিয়েচে হাটে হাটে। কুণ্ডুদের দোকানে যে এত চাল ছিল, বস্তা সাজানো থাকতো বালির বস্তার দেওয়ালের মত, সে গুদাম আজকাল শূন্যগর্ভ। পথেঘাটে ক্রমশঃ ভিখিরীর ভিড় বেড়ে যাচ্চে দিন দিন, এরা এতদিন ছিল কোথায় সকলেই ভাবে, অথচ কেউ জানে না। এ দেশের লোকও নয় এরা, বিদেশী ভিখিরী, একদিন অনঙ্গ-বৌ রান্নাঘরে রান্না করচে, হঠাৎ পাঁচ-ছটি অর্ধউলঙ্গ জীর্ণশীর্ণ স্ত্রীলোক, সঙ্গে তাদের সম্পূর্ণ উলঙ্গ বালক-বালিকা—ঘরের দাওয়ার ধারে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলো—ফ্যান খাইতাম—ফ্যান খাইতাম—

অনঙ্গ প্রথমটা ওদের উচ্চারণের বিকৃতির দরুন কথাটা কি বলা হচ্চে বুঝতে পারলে না। তা ছাড়া 'খাইতাম' এটা ক্রিয়াপদের অতীত কালের রূপ এসব দেশে, তা বর্তমানে প্রয়োগ করার সার্থকতা কি, এটা বুঝতেও একটু দেরি হোল।

পরে বুঝলে যখন তখন বললে—একটু দাঁড়াও—ফ্যান দেবো।

ওরা হাঁড়ি, তোবড়ানো টিনের কোটো পেতে ফ্যান নিয়ে যখন চলে গেল, তখন অনঙ্গ-বৌ কতক্ষণ ওদের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। এমন অবস্থা দাঁড়িয়েচে নাকি যে দেশ ছেড়ে এদের বিদেশে আসতে হয়েচে ছেলেমেয়ের হাত ধরে এক মগ ফ্যান ভিক্ষে করতে? অনঙ্গ বৌয়ের চোখে জল এল। নিজের ছেলেরা পাঠশালায় গিয়েচে, ওদের কথা মনে পড়লো। এতগুলো লোককে ভাত দেওয়ার উপযুক্ত চাল নেই ঘরে, নইলে দিত না হয় ওদের দুটো দুটো ভাত।

ক্রমে নানাস্থান থেকে ভীতিজনক সংবাদ আসতে লাগলো সব। অমুক গ্রামে চাল একদম পাওয়া যাচ্চে না, লোকে না খেয়ে আছে। অমুক গ্রামের অমুক লোক আজ পাঁচদিন ভাত খায় নি—ইত্যাদি। তবুও সবাই ভাবতে লাগলো, মানুষে কি সত্যি সত্যি না খেয়ে মরে? কখনই নয়। তাদের নিজেদের কোনো বিপদ নেই!

একদিন অনঙ্গ-বৌ খুব ভোরে ঘাটে গিয়ে দেখলে জেলেপাড়ার রয়ে জেলের বৌ ঘাটের ধারের কচুর ডাঁটা তুলে এক বোঝা করেচে।

অনঙ্গ হেসে বললে—কি গা রয়ের বৌ, আজ বুঝি কচুর শাক খাবে?

জেলে-বৌ যেন ধরা পড়ে একটু চমকে গেল। যেন সে আশা করে নি এত ভোরে কেউ নদীর ঘাটে আসবে। লুকিয়ে লুকিয়ে এ কাজ করছিল সে, এমন একটা ভাব প্রকাশ পেলে ওর ধরনধারণে।

সে মৃদু হেসে বললে—হ্যাঁ, মা।

—তা এত? এ যেন দু'তিন বেলার শাক হবে।

—সবাই খাবে মা, তাই।

বলেই কেমন এক অদ্ভুত ধরনে ওর মুখের দিকে চেয়ে জেলে-বৌ ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললে।

অনঙ্গ-বৌ অবাক হয়ে বললে—ওকি রয়ের-বৌ, কাঁদচিস্ কেন? কি হোল?

রয়ের-বৌ আঁচলে চোখের জল মুছে আস্তে আস্তে বলে—কাঁচ্চ কি সাধে মা? এই ভরসা।

—কি ভরসা?

—এই কচুর শাক মা। তিন দিন আজ কারো পেটে লক্ষ্মীর দানা সেধোয় নি।

—বলিস কি রয়ের-বৌ? না খেয়ে—

—নির্নাক্যি, মা নির্নাক্যি—তোমার কাছে মিছে কথা বলবো না সকালবেলা। কার দোরে যাবো, কে দেবে মোরে এই যুজ্যের বাজারে। যুজ্যের আক্রা ভাত কার কাছে গিয়ে চাইবো মা? তাই বলি এখনো কেউ ওঠে নি, গাঙের ধারে বড় বড় কচুর ডাঁটা হয়েচে তুলে আনি গে। তাই কি তেল নুন আছে মা? শুধু সেদ্ধ।

অন্নকষ্টের এ মূর্তিই কখনো দেখে নি অনঙ্গ। সে ভাবলে—আহা, আমার ঘরে যদি চাল থাকতো! আজ রয়ের-বৌ আর তার ছেলেমেয়েকে কি না খাইয়ে থাকি?

জেলে-বৌ আপন মনে বলতে লাগলো—এক সের দেড় সের মাছ ধরে। পয়সা বড় জোর দশ আনা বারো আনা হয়। এক কাঠা চাল কিনতি একটা টাকা যায়—তাও মিলে না হাটে বাজারে। মোরা গরীব নোক, কি করে চালাই বলো মা—

অনঙ্গ-বৌ আকাশপাতাল ভাবতে ভাবতে বাড়ী গেল। গঙ্গাচরণ ঘুম থেকে উঠে তামাক খেতে বসেচে। স্বামীকে বললে—হ্যাঁগা, এ কি রকম বাজার পড়লো চালের? ভাত বিনে কি সব উপোস দিতে হবে? আমাদের ঘরেও তো চাল বাড়ন্ত। আজকাল চালের ধান আর কেউ দেয় না। গাঁ থেকে ধান গেল কোথায়?

গঙ্গাচরণ বললে—তামার পয়সা যেখানে গিয়েচে।

অনঙ্গ-বৌ রেগে বললে—দ্যাখো ওসব রঙ্গরস ভাল লাগে না। একটা হিল্লে করো—ছেলেপুলে উপোস করে থাকবে শেষে?

গঙ্গাচরণ চিন্তিত মুখে বললে—তাই ভাবচি! আমি কি চুপ করে বসে আছি গা? কি হবে এ ভাবনা আমারও হয়েচে।

—চারিধারের ব্যাপার দেখে হাত-পা পেটের ভেতর ঢুকে যাচ্চে যে—আর বসে থেকো না। উপায় দ্যাখো। তিন দিনের মত চাল ঘরে আছে মজুত—

—আর ধান কতটা আছে?

—সে ভানলে বড় জোর পাঁচ কাঠা চাল হবে। তাতে ধরো আরো দশদিন। তার পরে?

—আমিও তাই ভাবচি।

—যা হয় উপায় করো।

দিন দুই পরে গঙ্গাচরণ পাঠশালা বন্ধ রেখে নরহরিপুরের হাটে গেল চালের সন্ধানে। বিষ্টুপুর, ভাতছালা, সুবর্ণপুর, খাড়দীঘি প্রভৃতি গ্রাম থেকে ধানচাল জড়ো হয়ে আগে আগে নরহরিপুরের প্রসিদ্ধ চালের ও ধানের হাট বোঝাই হয়ে যেতো—সেই হাটের অত বড় চালা-ঘর খালি পড়ে আছে—এক কোণে বসে শুধু এক বুড়ী সামান্য কিছু চাল বিক্রি করচে।

গঙ্গাচরণ কাছে গিয়ে বললে—কি ধানের চাল?

—কেলে ধান ঠাকুর মশায়। নেবেন? খুব ভালো চাল কেলে ধানের। কথায় বলে-

ধানের মধ্যি কেলে, মানুষের মধ্যি ছেলে—

বুড়ীর কবিত্বের দিকে তত মনোযোগ না দিয়ে গঙ্গাচরণ ওর ধামা থেকে চাল তুলে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো। যেমন মোটা, তেমনি গুমো। মানুষের অখাদ্য। তবুও চাল বটে, খেয়ে মানুষে প্রাণ বাঁচাতে পারে।

—কতটা আছে?

—সবটা নেবা তুমি? তিন কাঠা আছে।

—দাম?

—দেড় টাকা করে কাঠা।

গঙ্গাচরণ চমকে উঠলো, ভাবলে কথাটা সে শুনতে পায় নি! আবার জিজ্ঞেস করা পরেও যখন বুড়ী বললে এক কাঠার দাম দেড় টাকা, তখন গঙ্গাচরণের কপালে ঘাম দেখা দিয়েচে। দেড় টাকায় আড়াই সের, তা হোলে পড়লো চব্বিশ টাকা মণ। কি সর্বনাশ

অনঙ্গ-বৌ এত দিন পরের বাড়ীর ধান ভেনে চালিয়ে আসছিল বলে সে অনেকদিন হাটে বাজারের চালের দর জানে না। চাল এত চড়ে গিয়েচে তা তো তার জানা ছিল না। চারিদিক অন্ধকার দেখলো গঙ্গাচরণ। এত বড় নরহরিপুরের হাট—ধানচাল শূন্য। মানুষ এবার কি সত্যিই তবে না খেয়ে মরবে? কিসের কুলক্ষণ এসব? পরশুও তো চালের দাম এত ছিল না। দুদিনে ষোল টাকা থেকে উঠলো চব্বিশ টাকা এক মণ চালের দর—তাও এই মোটা, গুমো, মানুষের অখাদ্য আউশ চালের!

গঙ্গাচরণের সারা শরীরটা যেন ঝিম ঝিম করে উঠলো। কি করে সে চালাবে? নিজেদের ধানের ক্ষেত নেই। চব্বিশ টাকা মণের চাল সে কিনে খাওয়াতে পারবে ক'দিন, বারো টাকা যার মাসিক আয়? অনঙ্গ-বৌ না খেয়ে মরবে? হাবু পটল না খেয়ে—না, আর সে ভাবতে পারে না।

গঙ্গাচরণ চাল নিয়ে বাড়ী ফিরবার পথে দেখলে ধামা কাঠা হাতে আরও অনেকে হাটের দিকে ছুটেচে চালের চেষ্টায়। অনেকে ওকে জিজ্ঞেস করে, চাল কিনে পালেন ও পণ্ডিত মশাই? কি দর?

—চব্বিশ টাকা।

—মোটা আশ চাল চব্বিশ? বলেন কি পণ্ডিত মশাই?

—দেখ গে যাও হাটে গিয়ে।

বৃদ্ধ দীনু নন্দী একটা ধামা হাতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটচে। দীনু নন্দী বাড়ীতে বসে সোনা-রুপোর কাজ করে অর্থাৎ গহনা গড়ে। সোনার কাজ তত বেশি নয়, চাষা-মহলে গহনার কাজে সোনার চেয়ে রুপোর ব্যবহারই বেশি। কিন্তু এই দুর্দিনে গহনা কে গড়ায়, কাজেই দীনুর ব্যবসা অচল। দুটি বিধবা ভাই-বৌ, বৃদ্ধা মাতা ও কয়েকটি শিশুসন্তান, তৃতীয় পক্ষের তরুণী ভার্যা তার ঘাড়ে। দীনু বললে—পণ্ডিত মশায়, চাল পাবো?

—ছুটে যাও। বড্ড ভিড়।

—ছুটি বা কোত্থেকে, পায়ে বাত হয়ে কষ্ট পাচ্চি বড্ড। দুবেলা খাওয়া হয় নি—

—বল কি?

—সত্যি বলচি পণ্ডিত মশাই। বামুন দেবতা, এই অবেলায় কি মিছে কথা বলে নরকগামী হবো?

দীনু খোঁড়াতে খোঁড়াতে সজোরে প্রস্থান করলে।

গঙ্গাচরণ বাড়ী ফিরতে ফিরতেই কত লোক শুধু হাতেই হাট থেকে ফিরচে দেখা গেল। সাগরতলার কর্মকারদের বাড়ীতে একটু বসে তামাক খাচ্ছিল, এমন সময় দু'চার জন লোক সেখানে এসে জুটলো গল্প করতে।

একজন বললে—নরহরিপুরের হাটে চাল পাওয়া গেল না, আর কোথায় পাওয়া যাবে বলুন!

আর একজন বললে—লোকও জড়ো হয়েছে দেখুন গে। এক কাঠা চাল নেই। কেউ তিন দিন, কেউ পাঁচ দিন না খেয়ে আছে। আমারই বাড়ীতে দুদিন ভাত খায় নি কেউ।

গঙ্গাচরণ বললে—আটা ময়দা নিয়ে যে যাবে, তাও নেই।

—বস্তাপচা আটা আছে দু-এক দোকানে, বারো আনা সের। কে খাবে?

আরও মাইলখানেক এগিয়ে গেল গঙ্গাচরণ। খলসেখালির সনাতন ঘোষ নিজের ঘরের

দাওয়ায় বসে তামাক খাচ্চে, ওকে দেখে বললে—পণ্ডিত মশাই, ওতে কি? চা
নাকি?

—হ্যাঁ।

—কোথায় পেলেন?

—সে যা কষ্ট তা আর বোলো না। এক বুড়ীর কাছ থেকে সামান্য কিছু আদায় করে
তাও আগুন দর।

—কই দেখি দেখি?

সনাতন ঘোষ নেমে এসে ওর হাতের পুঁটুলিটা নিজের হাতে নিয়ে পুঁটুলি নিজেই খু
চাল দেখতে লাগলো। ওর মুখটা যেন কেমন হয়ে গেল। চালের দানা পরীক্ষা কর
করতে বললে—বড্ড মোটা। কত দর নিলে? একটা কথা বলবো পণ্ডিত মশাই?

—কি?

—দাম আপনি যা হয় দিচ্চি। আমায় অর্ধেকটা চাল দিয়ে যান। দিতেই হবে। দু'দি
না খেয়ে আছে সবাই। মেয়েকে শ্বশুরবাড়ীর থেকে এনে এখন মহা মুশকিল, সে বেচার
পেটে আজ দু'দিন লক্ষ্মীর দানা যায় নি—কত চেষ্টা করেও চাল পাই নি—

সনাতন ঘোষের অবস্থা খারাপ নয়, বাড়ীতে অনেকগুলো গরু, দুধ থেকে ছানা কাটি
নরহরিপুরের ময়রাদের দোকানে যোগান দেয়—এই তার ব্যবসা। গঙ্গাচরণ ইতিপু
সনাতনের বাড়ী থেকে দু-এক খুলি টাটকা ছানা নিয়েও গিয়েচে। তার আজ এই দশ
কিন্তু চাল মাত্র সে নিয়েচে তিন কাঠা। অন্য কোথাও চাল পাওয়া যাচ্চে না। এ চ
দিলে তার স্ত্রী-পুত্র অনাহারে থাকবে দুদিন পরে। চাল দেওয়ার ইচ্ছে তার মোটেই নেই-
এদিকে সনাতন মোক্ষম ধরেচে চালের পুঁটুলি, তার হাত থেকে চাল নিতান্তই ছিনিয়ে নি
হয় তাহলে। কিংবা ঝগড়া করতে হয়।

সনাতন ততক্ষণে কাকে ডেকে বললে—ওরে একটা ধামা নিয়ে আয় তো বাড়ীর ম
থেকে? একটা কাঠাও নিয়ে আয়—

সনাতন নিজের হাতে এক কাঠা চাল যখন মেপে ঢেলে নিয়েচে, তখন গঙ্গাচরণ মিনতি
সূচক ভদ্রতার সুরে বললে—আর না সনাতন, আর নিও না—

-আর আধ কাঠা—

-না বাপু, আমি আর দিতে পারবো না। বাড়ীতে চাল বাড়ন্ত—বুঝলে না?

সনাতনের নাতিটি বললে—দাদামশাই, ও'র চাল আর নিও না, দিয়ে দাও।

সনাতন মুখ খিঁচিয়ে বলে উঠলো—তোদের জন্যি বাপু খেটে মরি, নিজের জন্যি কিসে
ভাবনা। একটা পেট যে করে হোক চলে যাবেই। রইল পড়ে চাল, যা বুঝিস করগে যা

রাগ না লক্ষ্মী। গঙ্গাচরণ বিনা চক্ষুলজ্জায় সমস্ত চাল উঠিয়ে নিয়ে চলে এল। বা
এসে দেখলে অনঙ্গ-বৌ ভাত চড়িয়ে ওল কুটতে বসেচে রান্নাঘরের দাওয়ায়। স্বামীকে দে
বললে—ওগো শোনো, আমি এক কাজ করিচি। সেদিন সেই বোষ্টম প্রভাতী সুরে গ
করছিল, মনে আছে? আজ এসেছিল, কি সুন্দর গান যে গায়!

—কে বল তো?

—সেই যে বলে—'উঠ গো উঠ নন্দরাণী কত নিদ্রা যাও গো'—বেশ গলা—লম্বা ম
ফর্সা মত বোষ্টমটি—

—ওর বাড়ী বেনাপোল। বেনাপোলে হরিদাস ঠাকুরের পীঠ আছে, সেখানকার কাজ-
করতো। বেশ গায়

আমি তাকে বললাম রোজ সকালে এসে আমাদের বাড়ীতে ভগবানের নাম করবে।
রবেলায় বড় ভাল লাগে ভগবানের নাম। মাসে একটা টাকা আর এক কাঠা চালের একটা
ধ দিতে হবে বলেচে, এই ধরো ডাল, নুন, বড়ি, দুটো আলু, বেগুন, একটু তেল—এই।
ম বলিচি দেবো। কাল থেকে গাইতে আসবে। হ্যাঁগা, রাগ করলে না তো শুনে?

তোমার যে পাগলামি। বলে, নিজে খেতে জায়গা পায় না, শঙ্করাকে ডাকে। দেবে
থা থেকে?

তুমি ঝগড়া কোরো না। সকালে উঠে ভগবানের নাম শুনবে যে রোজ রোজ তখন?
হুঁ—আমি যেখান থেকে পারি জুটিয়ে দেবো, তুমি ভেবো না কিছু। গরীব বলে কি
া গান শুনতে নেই?

পরদিন খুব ভোরে সেই বোষ্টমটি সুস্বরে প্রভাতী গান গাইতে গাইতে ওদের উঠানে
া দাঁড়ালো। অনঙ্গ-বৌ খুশিতে ভরপুর হয়ে পাশের ঘরে এসে স্বামীকে ডেকে বললে—
া শুনচো? কেমন গায়? আর ভগবানের নাম—বেশ লাগে—না?

গঙ্গাচরণ কিছু জবাব না দিয়ে মৃদু হেসে পাশ ফিরে শুয়ে রইল। অনঙ্গ-বৌ রাগ করে
লে—আহা, ঢং দ্যাখো না! ওগো গান শোনো—তাতে জাত যাবে না।

আমি কি রাজা যে বন্দীরা প্রভাতী গান গেয়ে আমার ঘুম ভাঙাবে? তোমার পয়সা
ক তুমি বন্দীদের মাইনে দিয়ো গো রানী। আমি ওর মধ্যে নেই।

—আমার বন্দীর গান যে শুনবে, তাকে পয়সা দিতে হবেই। তবে কানে আঙুল দাও—
গঙ্গাচরণ হেসে কান চেপে ধরে বললে—এই দিলাম।

একটু বেলা হোলে অনঙ্গ-বৌ রান্না চড়ালে, তার পরে মনে মনে হিসেব করে দেখলে দিন
-বারো পরে চাল একেবারে ফুরিয়ে যাবে, তখন উপায় কি হবে? চাল নাকি হাটে পাওয়া
চ্চ না। সবাই বলচে। তার স্বামী নির্বিরোধী মানুষ, কোথা থেকে কি যোগাড় করবে
দুর্দিনে? ভাবলে মায়া হয়।

কাপালীদের ছোট-বৌ চুপি চুপি এসে বললে—বামুন-দিদি, একটা কথা বলবো? এক
চ চাল ধার দিতে পারো?

মুশকিল করলি ছোট-বৌ। তোদের চাল কি বাড়ন্ত!

—মোটে নেই। কাল ছোলা সেদ্ধ খেয়ে সব আছে। না হয় ছোট ছেলেটিকে দুটি
দিও এখন দিদি। আমরা যা হয় করবো এখন।

অনঙ্গ-বৌ কি ভেবে বললে—একটু দাঁড়া। এসেচিস যখন তখন নিয়ে যা এক খুঁচি
। ওতে আমাদের কতদিনের সাশ্রয় বা হোত?

কাপালী-বৌ চাল আঁচল পেতে নিয়ে বললে—এক জায়গায় কচুর শাক আছে তুলতে যাবে
ন-দিদি? গেরামে তো কচুর শাক নেই—যে যেখান থেকে পারচে তুলে নিয়ে যাচ্চে।
ের ধারে এক জায়গায় সন্ধান করিচি, ঢের কচুর শাক হয়ে আছে। দুজনে চলো চুপি
তুলে আনি।

—চল্, আজ দুপুরে যাবো। চাল তো নেই। যা দেখচি ওই খেয়েই থাকতে হবে
ন পরে।

কাপালী-বৌ হেসে বুড়ো আঙুল তুলে নাচিয়ে বললে—লবডঙ্কা! তাই বা কোথায় পা বামুন-দিদি? কাওরাপাড়ার মাগী-মিন্সে এসে গাঙের ধারের যত শুষনি শাক, কলমি শা হেলেঞ্চা শাক, তুলে উজোড় করে নিয়ে যাচ্চে দিনরাত। গিয়ে দ্যাখো গো কোথাও নেই আমি কি খোঁজ করি নি বামুন-দিদি? ওই খেয়ে আজ দু'দিন বেঁচে আছি—ওই সব আর ছোলা সেদ্ধ। তোমার কাছে মিথ্যে কথা বলে বড়াই করে কি করবো?

বিশ্বাস মশায়ের বাড়ী মিটিং বসেচে।

বর্তমান সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্যেই মিটিং, তবে কাপালী-পাড়ার লোক ছাড়া অন্য কোনো লোক এতে উপস্থিত নেই। ক্ষেত্র কাপালী বললে—এখন ধান আমাদের দেবেন কিনা বলুন বিশ্বেস মশায়।

বিশ্বাস মশায় অনেকক্ষণ থেকে সেই একই কথা বলচেন—ধান নেই, তার দেবো কি আমার গোলা খুঁজে দ্যাখো।

অধর কাপালী বললে—আমাদের পাড়াটা আপনি কর্জ দিয়ে বেঁচিয়ে রাখুন। আসচে বারে আপনার ধার এক দানাও বাকি রাখবো না।

বিশ্বাস মশায়ের বাঁ-দিকে গঙ্গাচরণ অনেকক্ষণ থেকে বসে আছে। সে এসেছিল ধানচাল সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করা যায় কিনা বিশ্বাস মশায়ের সাহায্যে সেই চেষ্টায়। এত বড় মিটিং এর মধ্যে এসে পড়বে তা সে ভাবে নি। সে চুপ করে বসেই আছে।

হঠাৎ তার দিকে ফিরেই বিশ্বাস মশায় বললেন—পণ্ডিত মশাই, আপনি এই নিন গোলার চাবি। এদের গিয়ে খুলে দেখান ওতে কি আছে—

বিশ্বাস মশায় চাবিটা গঙ্গাচরণের সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিতেই ক্ষেত্র কাপালী বলে উঠলো—গোলা দেখতি হবে না। আমরা জানি ও গোলাতে আপনার ধান নেই।

চটে উঠে বিশ্বাস মশায় বললেন—তবে কোথায় আছে?

—আপনি ধান লুকিয়ে রেখেছেন বাড়ীতে।

—তুমি দেখেচ?

—দেখতে হবে না, আমরা জানি।

কথা শেষ করে ক্ষেত্র কাপালী মিটিং ছেড়ে উঠে চলে গেল।

অধর কাপালী অনুনয়ের সুরে বললে—শুনুন, বিশ্বেস মশায়, আপনি পাড়ার মা-বাপ বিপদে যদি আপনি না বাঁচান, তবে ছেলেপিলে নিয়ে কোথায় দাঁড়াই বলুন দিকি? অমন করবেন না। ধানের ব্যবস্থা আজ করে দিতেই হবে আপনাকে।

বিশ্বাস মশাই দাঁত খিঁচিয়ে বললেন—অমনি বলে সবাই! তুমি তো আমার ঘাড়ে ফেলে দিয়ে দিব্যি নিশ্চিন্দি হলে—তারপর ঠ্যালা সামলায় কে শুনি? ধান আমার নেই।

—একটু দয়া করুন—এটু আমাদের দিকে চান। আজ দুদিন বাড়ীতে একটা চালের দানা কারো পেটে যাই নি, সত্যি বলচি।

—বেশ, তুমি আধ কাঠা চাল ঘর থেকে নিয়ে যাও না, তাতে কি? না হয় আমি এক মুঠো কম খাবো। সে কথা তো বললিই হয়, কি বলেন ঠাকুর মশাই?

গঙ্গাচরণ চুপ করে রইল, এ কথায় সায় দিলে পাড়ার লোকে তার ওপর চটে যাবে, সবাইকে নিয়ে বাস করতে হবে যখন, কাউকে সে চটাতে চায় না।

সভা বেশিক্ষণ চললো না। বিশ্বাস মশায়ের কাছে যারা দরবার করতে এসেছিল, সবাই বুঝলে এখানে ডাল গলানো শক্ত। যে যার বাড়ী চলে গেল।

গঙ্গাচরণ সুযোগ পেয়ে বললে—বিশ্বাস মশায়, আমি কি না খেয়ে মরবো?

—কেন?

—বাজারে চাল অমিল। আর দুদিন পরে উপোস শুরু হবে। কি করি পরামর্শ দিন।

—আমার বাড়ী থেকে দু'কাঠা চাল নিয়ে যাবেন।

—তা দিয়ে ক'দিন চলবে বলুন।

—কেন?

—আমার বাড়ীর পুষ্যি দু'তিনজন। ও দু'কাঠা চাল নিয়ে ক'দিন খাবো? আমার স্থায়ী একটা ব্যবস্থা না করলে এই বিপদের দিনে আমি কোথায় যাই? পাঠশালা চালাই কি খেয়ে?

—আমার ধানচাল থাকতো তো বলতে পারা যেতো কিন্তু আমার নেই। আজ দু'কাঠা চাল নিয়ে যান, দিচ্চি—

গঙ্গাচরণ চাল নিয়ে চলে গেল।

সে রাত্রে বিশ্বাস মশায় আহারাদির পর পুকুরপাড় থেকে গরু আনতে গিয়েছেন, কারণ সেখানেই তাঁর গোয়াল—এমন সময় দুজন লোককে গাছের আড়ালে দেখে বলে উঠলেন—ওখানে কে?

—তোর বাবা—

সঙ্গে সঙ্গে তারা এসে বিশ্বাস মশায়েব মাথায় সজোরে এক লাঠি বসিয়ে দিলে। এর পর ওরা তাঁকে পুকুরপাড়ের বাবলা গাছেব সঙ্গে মোটা দড়া দিয়ে বেঁধে ফেললে। বিশ্বাস মশায়ের জ্ঞান রইল না বেশিক্ষণ, মাথার যন্ত্রণায় ও রক্তপাতে।

জ্ঞান হয়ে প্রথমেই দেখলেন সূর্যের আলো জানলা দিয়ে এসে পড়েচে, তাঁর বিধবা বড় মেয়ে তাঁর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে কাঁদচে।

বিশ্বাস মশায় বলে উঠলেন—ডাকাত! ডাকাত!

বড় মেয়ে সৌদামিনী বললে—ভয় কি বাবা? আমি—আমি যে—এই দ্যাখো।

বিশ্বাস মশায় ফ্যালফ্যাল চোখে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে চেয়ে চুপ করে রইলেন।

সৌদামিনী বললে—বাবা কেমন আছ?

বিশ্বাস মশায় একবার ডাইনে বাঁয়ে সতর্কতার সঙ্গে চেয়ে দেখে চুপি চুপি বললে—সব নিয়ে গিয়েচে?

—কি বাবা?

—সেই সব।

—তুমি কিছু ভেবো না বাবা। সব ঠিক আছে।

—সেই যা আড়ায় তোলা আছে? বস্তা?

—কিছু নেয় নি।

—আমাকে নিয়ে গিয়ে দেখা মা—

সৌদামিনী বাপের মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে বললেন—তুমি সেরে সেমলে ওঠো, আমি কি মিথ্যে বলচি তোমারে? আড়ার ওপর যে বস্তা রেখিলে তা কেউ নেয় নি।

—তক্তাপোশের তলায় যে বস্তা ছিল ?

—সব ঠিক আছে। নেবে কে ?

এই সময় গঙ্গাচরণ ঘরে ঢোকাতে ওদের কথা বন্ধ হয়ে গেল।

গঙ্গাচরণ পাশে বসে বললে—কেমন আছেন বিশ্বেস মশায় ?

—আছি এক রকম।

গঙ্গাচরণ মুরুব্বীয়ানা ভাবে বললে—হাতটা দেখি—

পরে বিজ্ঞের মত মুখ করে বিশ্বাস মশায়ের নাড়ী পরীক্ষা করে বললে—হুঁ—

সৌদামিনী উদ্বিগ্ন সুরে বললে—কি রকম দেখলেন পণ্ডিত মশাই ?

—ভালো। তবে কফের ধাত একটু প্রবল হয়েছে।

সৌদামিনী উদ্বিগ্ন সুরে প্রশ্ন করলে—তাতে কি হয় ?

—হবে আর কি। তবে বয়েস হয়েছে কিনা, কফের আধিক্য—

—ভাল করে বলুন।

—মানে জিনিসটা ভাল না।

বিশ্বাস মশায় স্বয়ং এবার মিনতির সুরে বললেন—আমাকে এবারটা চাঙ্গা করে তুলুন পণ্ডিত মশাই। আপনি দশ সের চাল নিয়ে যাবেন।

—থাক থাক, তার জন্যে কি হয়েচে ?

সৌদামিনী কিন্তু ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলে উঠলো—না, আজই নিয়ে যাবেন'খন। ধামা আমি দেবো।

বিশ্বাস মশায় বললেন—এখন নয়। সন্দের পরে। কেউ টের না পায়।

গঙ্গাচরণ এ অঞ্চলে কবিরাজিও করে। কিন্তু কবিরাজি এখানে ভাল চলে না—কারণ এখানকার সবার 'সারকুমারী মত'। সে এক অদ্ভুত চিকিৎসার প্রণালী। জ্বর যত বেশিই হোক, তাতে স্নানাহারের কোনো বাধা নেই। দু'চারজন সেরেও ওঠে, বেশির ভাগই মরে! তবু ও-মতের লোক কখনো ডাক্তার বা কবিরাজ দেখাবে না, মরে গেলেও না।

গঙ্গাচরণ কথাটা জানে, তাই বললে—আপনার সেই সারকুমারী মতের ফকির আসবে নাকি ?

—নাঃ। সেবার জলজ্যান্ত নাতিটাকে মেরে ফেললে। আমি ও-মতে আর নেই।

—ঠিক তো ? দেখুন, তবে আমি চিকিচ্ছে করি মন দিয়ে।

সৌদামিনী বলে উঠলো—আপনি দেখুন ভালো করে। আমি ও-মতে আর কাউকে যেতে দেবো না এ বাড়ীতে। চাল নিয়ে যাবেন সন্দের পরে।

দিন দুই পরে বিশ্বাস মশায় একটু সুস্থ হয়ে উঠলেন। একদিন গঙ্গাচরণ গিয়ে দেখলে বিশ্বাস মশায় বিছানায় উঠে বসে তামাক খাচ্চেন। গঙ্গাচরণ শুনলে, এ গ্রাম থেকে বিশ্বাস মশায় উঠে যাচ্চেন। জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা হচ্চে। বাইরে আট-দশখানা গরুর গাড়ীর চাকার দাগ। রাত্রে এই গাড়ীগুলো যাতায়াত করেচে বলেই মনে হয়। গঙ্গাচরণ বুঝতে পারলে বিশ্বাস মশায় মজুদ ধান চাল সব সরিয়ে দিয়েচেন রাতারাতি।

গঙ্গাচরণ বললে—কোথায় যাবেন চলে নিজের গাঁ ছেড়ে ?

বিশ্বাস মশায় বললেন—আপাতোক যাচ্ছি গঙ্গানন্দপুর, আমার শ্বশুরবাড়ী। ঐ গাঁয়ে আর থাকবো না। এ ডাকাতের দেশ। সামান্য দু'চার মণ ধান চাল কে না ঘরে রাখে বলুন তো পণ্ডিত মশায়। তার জন্যে মানুষ খুন? আজ ফসকে গিয়েচে, কাল যে খুন করবে না তার ঠিক কি? না, এ দেশের খুরে নমস্কার বাবা।

—আপনার জমিজমা পুকুর এ সবের কি ব্যবস্থা হবে?

—আমার ভাগ্নে দুর্গাপদ মাঝে মাঝে আসবে যাবে। সে দেখাশুনো করবে। আমি আর এমুখো হচ্চি নে কখনো। ঢের হয়েচে। ভাল কথা, একটা ভাল দিন দেখে দেবেন তো যাবার?

বুধবার সকালবেলা বিশ্বাস মশায় সত্যসত্যই জিনিসপত্র সমেত নতুন গাঁ কাপালী-পাড়ার বাস উঠিয়ে চলে গেলেন।

অনঙ্গ-বৌ শুনে বললে—এই বিপদের দিনে তবুও এই একটা ভরসা ছিল। কোথাও চাল না পাওয়া যায়, ওখানে তবু পাওয়া যেতো।। এবার গাঁয়ের খুব দুর্দশা হবে। একদানা ধানচাল কারো ঘরে রইল না আর। ভয়ে পড়েই লোকটা চলে গেল।

শ্রাবণ মাসের শেষ।

বেড়ায় বেড়ায় তিৎপল্লার ফুল ফুটেচে। কোঁচ বকের লম্বা সারি নদীর ওপর দিয়ে উড়ে যায় এপার থেকে ওপারের দিকে।

অনঙ্গ-বৌ নদীর ঘাটে জল তুলতে গিয়েচে। ভুষণ ঘোষের বৌ এক জায়গায় হাবড় কাদার ওপর ঝুঁকে পড়ে কি করচে। অনঙ্গ-বৌকে দেখে সে যেন একটু সঙ্কুচিত হয়ে গেল। যেন এ অবস্থায় কারো সঙ্গে না দেখা হওয়াই ভালো ছিল, ভাবটা এমন।

অনঙ্গ-বৌ কৌতুহলের সঙ্গে বললে—কি হচ্ছে গো গয়লা-দিদি?

ভুষণ ঘোষের বৌয়ের বয়স বেশী নয়, অনঙ্গ-বৌয়ের সমবয়সী কিংবা দু-এক বছরের বড় হতেও পারে। আঁচলে কি একটা ঢেকে সলজ্জভাবে বললে—কিছু না ভাই—

—কিছু না তবে ওখানে কি হচ্চে তোমার মরণ?

—এমনি।

—তবুও?

—সুষনি শাক তুলচি—

বলেই হঠাৎ সলজ্জ হাসি হেসে আঁচল দেখিয়ে বললে—মিথ্যে কথা বলবো না বামুনের মেয়ের সামনে। এই দ্যাখো—

অনঙ্গ-বৌ বিস্ময়ের সঙ্গে বললে—ও কি হবে? হাঁস আছে বুঝি?

গয়লা-বৌয়ের আঁচলে একরাশ কাদামাখা গেঁড়ি-গুগলি। সে বললে—হাঁস নয় ভাই, আমরাই খাবো।

—ও কি করে খায়?

—এমনি! শাঁস বের করে ঝাল-চচ্চড়ি হবে।

—সত্যি?

—অনেকে খায়, তুমি জানো না! আমরা শখ করে খাই ভাই।

—কি করে রাঁধে আমাকে বলে দিও তো?

—না ভাই। তুমি খেতে যাবে কি দুঃখে? তোমাকে বলে দেবো না।

সেদিনই একটু বেলা হোলে কাপালীদের ছোট-বৌ এসে বললে—এক খুঁচি চাল ধার দিতি পারো ভাই? বড্ড লজ্জায় পড়িচি—

অনঙ্গ-বৌ বললে—কি ভাই?

—ভূষণ কাকার বৌ এসেছে দুটো চাল নিতি। দু'দিন ভাত পেটে যায় নি। দুটো গেঁড়ি-গুগলি তুলে এনেচে সেদ্দ করে খাবে। কিন্তু দুটো চাল নেই—আমার বাড়ী এসেচে—তা বলে, তুমি খাও ভাঁড়ে জল, আমি খাই ঘাটে—

—আমারও চাল নেই ভাই।

—দু'টো একটা হবে না?

—আছে, দেবার মত নেই। তোর কাছে নুকুবো না। সের চারেক চাল আছে, তা থেকে দেবো না। তিন বেলার খোরাকও নেই।

কাপালী-বৌ বসে পড়ে গালে হাত দিয়ে টেনে টেনে বললে—তাই তো, কি হবে উপায় দিদি? চাল তো কোথাও নেই। কি করি বল তো?

অনঙ্গ-বৌ বললে—ছিল বিশ্বেস মশায়, তার ঘরে যা হয় দুটো ধান চাল ছিল। সেও চলে গেল—

—আমরাও তো তাই বলি—

—তবে কোন্ সাহসে চাল দেবো বের করে?

—তা তো সত্যি কথাই।

হঠাৎ অনঙ্গ-বৌ হেসে বললে—রাগ করলি ভাই ছোট-বৌ?

—না ভাই, এর মধ্যে রাগ কিসের?

—আঁচল পাত। চাল নিয়ে যা—

—তোমাদের?

—যা হয় হবে। তবু থাকতে দেবো না তা কি হয়? নিয়ে যা—

দিন কতক পরে চালের ঘোর অনটন লোকের ঘরে ঘরে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের বাড়ী এসে চাল ধার চায়, কে কাকে দেবে? অনঙ্গ-বৌ দুদিন ছেলেদের মুখে ভাত দিতে পারলে না, শুধু সজনে শাক সেদ্ধ। একদিন এসে কাপালী-বৌ দুটো সুষনি শাক দিয়ে গেল, এক-দিন গঙ্গাচরণ কোথা থেকে একখানা থোড় নিয়ে এল। ভাতের ফ্যান চেয়ে ঘরে ঘরে ফিরচে ত্রিপুরা জেলা থেকে আগত মেয়েপুরুষ। গ্রামে হাহাকার পড়ে গেল।

সন্ধ্যার দিকে রামলাল কাপালী এসে গঙ্গাচরণকে চুপি চুপি বললে—পণ্ডিত মশায়, চাল নেবেন?

গঙ্গাচরণ বিস্ময়ের সুরে বললে—কোথায়?

—মেটেরা বাজিতপুর থেকে আমার শ্বশুর এক বস্তা চাল নিয়ে লুকিয়ে পালিয়ে এসেচেন আমার বাড়ী। দেড় মণ চাল, বেনামুড়ি ধানের ভাল চাল। ছোট-বৌ বললে—বামুনদিদির বাড়ী বলে এসো।

—কি দর?

—শ্বশুর বলচেন চল্লিশ টাকা করে মণ—

—আউশ চালের মণ চল্লিশ টাকা ?

—তাই মিলচে না দাদাঠাকুর। আপনি তো সব জানো।

গঙ্গাচরণ ইতস্ততঃ করতে লাগলো। দু'গাছা পাতলা রুলি আছে অনঙ্গ-বৌয়ের হাতে। একবার গেলে আর হবে না।

কিন্তু উপায় কি ? ছেলেপুলেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে তো ? বাড়ীতে এসে স্ত্রীর কাছে বলতেই তখুনি সে খুলে দিলে। এক মণ চালই এসে ঘরে উঠলো।

রামলাল কাপালী বলে দিলে—চুপি চুপি নিয়ে যাবেন দাদাঠাকুর।

সন্ধ্যার অনেক পরে চাল নিয়ে আসতে গিয়ে গঙ্গাচরণ ও তার দুই ছেলে পড়ে গেল নিমাই জেলের সামনে। সে নদীতে যাচ্চে আলোয় মাছ ধরতে। ওদের দেখে বললে—কে ?

গঙ্গাচরণ বললে—এই আমরা।

—কে পণ্ডিত মশাই ? পেন্নাম হই। কি ওতে ?

—ও আছে।

—ধান বুঝি—পণ্ডিত মশাই ?

—হাঁ।

নিমাই জেলের বিধবা মেয়ে পরদিন ভোর না হতে এসে হাজির। না খেয়ে মারা যাচ্ছে ওরা, দুটো ধান দিতে হবে। অনঙ্গ-বৌ মিথ্যে কথা বলতে তেমন পারে না, না ভেবেই বলে বসলো—ধান তো নেই ঘরে, চাল এনেছিলেন কিনে উনি।

—তাই দুটো দ্যান বামুন-দিদি, না খেয়ে মরচি।

দিতে হোল। ঘরে থাকলে না দিয়ে পারা যায় না। দলে দলে দলে এ-পাড়া ও-পাড়া থেকে লোক আসতে লাগলো। কেউ ভাত দাও, কেউ চাল দাও দুটি। এক মণ চাল দশ দিনে উঠে গেল, মাঝে পড়ে অনঙ্গ-বৌয়ের শেষ সম্বল রুলি দু'গাছা অনন্তের পথে যাত্রা করলো।

ইতিমধ্যে একদিন ভাতছালা থেকে মতি মুচিনী এসে হাজির।

অনঙ্গ-বৌ বললে—কি রে মতি ? আয় আয়—

মতি গলায় আঁচল দিয়ে দূর থেকে প্রণাম করে বললে—গড় করি দিদি-ঠাকরুণ।

—কি রকম আছিস ? এ রকম বিচ্ছিরি রোগা কেন ?

—ভালো না দিদি-ঠাকরুণ। না খেয়ে খেয়ে এমনি দশা।

—তোদের ওখানেও মন্বন্তর ?

—বলেন কি দিদি-ঠাকরুণ, অত বড় মুচিপাড়ার মধ্যে লোক নেই। সব পালিয়েছে।

—কোথায় ?

—যে দিকি দু' চোক যায়। দিদি-ঠাকরুণ, সাতদিন ভাত খাই নি, শুধু চুনো মাছ ধরতাম আর গেঁড়ি-গুগলি। তাও এদানি মেলে না। ভাতছালার সেই বিলির জল ঘোল-দই। শুধু দ্যাখো মুচিপাড়া, বাগদিপাড়ার মেয়ে-ছেলে বৌ-ঝি সব সেই একগলা জলে নেমে চুনো মাছ আর গেঁড়ি-গুগলি ধরচে। সব ফুরিয়ে শেষ হয়ে গেল। আর আধ পোয়া মাছও হয় না। ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে ডাঙায় বসে কাঁদছে, ওদের মা কাঁচা গেঁড়ি-গুগলি তুলে ওদের মুখে দিয়ে কান্না থামিয়ে এসে আবার জলে নেমেচে। কত মরে গেল ওই সব খেয়ে। নেতু বুনোর ছোট মেয়েটা তো ধড়ফড় করে মরে গেল পেটের অসুখে।

—বলিস কি মতি ?

—আর বলবো কি। অত বড় মুচিপাড়া ভেঙে গিয়েচে দিদি-ঠাকরুণ।

—কেন ?

—কে কোথায় চলে গেল! না খেয়ে ক'দিন থাকা যায় বলুন? যার চোক যেদিকে যায় বেরিয়ে পড়েচে। আমার ভাই দুটো, অমন জোয়ান ভাইপো দুটো না খেয়ে খেয়ে এমনি খ্যাংরা কাটি—তারপর কোন দিকি যে তারা চলে গেল তা জানি নে। আহা, অমন জোয়ান দুই ভাইপো!—আর এই দ্যাখো আমার শরীল—

হাত দুটো বের করে দেখিয়ে মতি মুচিনী হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলো।

অনঙ্গ-বৌ তাড়াতাড়ি ওর কাছে গিয়ে বললে—কাঁদিস নে মতি। জল খা, একটু গুড় দি। ভাত দেবো। ক'দিন খাস নি ?

মতি দু'হাতের আঙুল ফাঁক করে বললে—সাত দিন।

শেষ পর্যন্ত মতি মুচিনীর অবস্থা অনঙ্গ-বৌয়ের মনে ভয় ঢুকিয়ে দিলে।

না খেয়েও তাহলে মানুষ কষ্ট পায়, নয়তো ভাতছালার অতগুলো মুচির অবস্থা আজ এরকম হোল কি করে ?

এই অসময়ে আবার একদিন এসে পড়লো কামদেবপুরের দুর্গা পণ্ডিত।

সেদিন অনঙ্গ-বৌ দুটো সুষনি শাক তুলে এনেচে নোনাতলার জোল থেকে, সে যেন এক পরম প্রাপ্তি। খুব বেলা গেলে কাপালীদের ছোট-বৌ সেদিন ডাকলে—ও বামুন-দিদি, চলো এক জায়গায়—

—কোথায় রে ছুটকি ?

—নোনাতলার জোলে—

—কেন রে, এত বেলা গেলে নোনাতলার জোলে ? তোর নাগর বুঝি নুকিয়ে তোর সঙ্গে দেখা করবে ?

—আ মরণ বামুন-দিদির। সোয়ামী আছে না আমার ? অমন বুঝি বলতি আছে সোয়ামী যাদের আছে তাদের ? তোমরা রূপসী-বৌ, তোমাদের নাগর থাকুক, আমার দিকি কে তাকাবে তোমরা থাকতি ? তা না গো—সুষনি শাক হয়েচে অনেক, নুকিয়ে তুলে আনি চলো। কেউ এখনো টের পায় নি। টের পেলে আর থাকবে না।

নোনাতলার জোল গ্রামের পেছন দিকের বাঁশবন আমতলার পেছনে ঘন ঝোপে ঘেরা জায়গা। বর্ষাকালে নিচু জায়গাতে জল বাধে—এখন জল নেই—শরতের শেষে জলাশয় শুকিয়ে উঠচে। ভিজে মাটির ওপর নতুন সুষনি শাক একরাশ গজিয়েচে দেখে অনঙ্গ-বৌয়ের মুখে হাসি ধরে না। বললে—এ যে ভাই অনেক।

কাপালী-বৌ হাসতে হাসতে বললে—একেই বলে কাঙালকে শাকের ক্ষেত দেখানো!

—তা হোক, কারো চুরি তো করচি নে।

—ভগমানের জিনিস হয়ে আছে, তুলে খাও। এখনো কেউ টের পাই নি তাই রক্ষে। নইলে ভেসে যেতো সব এতদিন।

অনঙ্গ-বৌ আবার ভীতু মেয়ে, একটা শেয়াল ঝোপের দিকে খসখস করতেই চমকে উঠে বলে উঠলো—কি রে কাপালী-বৌ, বাঘ না তো ?

—বাঘ না তোমার মুণ্ডু বামুন-দিদি। দ্যাখো না চেয়ে—

—তুই কি করে এ বনলা জায়গায় শাকের সন্ধান পেলি ? সত্যি কথা বল্ ছুট্‌কি—'

অনঙ্গ-বৌ কাপালীদের ছোট-বউয়ের স্বভাবচরিত্রের কথা কিছু কিছু না জানতো এমন নয়। গোড়া থেকেই ওর মনে সন্দেহ না হয়েছিল এমন নয়।

কাপালী-বৌ হাসতে হাসতে বললে—দূর—

—আবার ঢাকছিস ? এখানে তুই কি করে এলি রে ? কখন এলি ? এখানে মানুষ আসে ?

—এ্যালাম।

—কেন এলি ?

কাপালী-বৌয়ের মুখ সলজ্জ হয়ে উঠলো। বললে—এমনি।

—মিথ্যে কথা। এমনি নয়। বলি, হ্যাঁরে ছুট্‌কি, তোর ও স্বভাব গেল না ? ভারি খারাপ ওসব, জানিস ? স্বামীকে ঠকিয়ে ওসব এখনো করতে তোর মন সরে ? ছিঃ—

কাপালী-বৌ চুপ করে রইল। অন্য কেউ এমন কথা বললে সে রেগে ঝগড়া-ঝাঁটি করতো, কিন্তু অনঙ্গ-বৌয়ের মধ্যে এমন কিছু আছে যাতে কারো সাধ্য হয় না তার মুখের ওপর কথা কইতে। বিশেষ করে যখন সে একটা এমন ধরনের ব্যাপারের প্রতিবাদ করচে।

অনঙ্গ-বৌ বললে—না সত্যি ছুট্‌কি, তুই রাগ করিস নে। আমি ঠিক কথা তোরে বলচি—

কাপালী-বৌ ঝাঁকি মেরে মুখ ওপরের দিকে ফুটন্ত ফুলের মত তুলে বললে—আমি কি আসতে চাই ? আমাকে ছাড়ে না যে—

—কে ?

—নাম নাই বললাম বউ-দিদি ?

—বেশ যাক্ সে। না ছাড়লেই তুই অমনি আসবি ?

—আমার চাল যোগাড় করে এনে দেয়। সত্যি, বউ-দিদি তুমি সতী নক্ষী ভাগ্যিমানি —মিথ্যে বলবো না তোমার কাছে, বামুন দেবতা। সেদিন আমি না খেয়ে উপোস করে আর পারি নে। খিদে সহ্যি করতে পারি নে ছেলেবেলা থেকি। বাপ মা থাকতি, সকাল সকাল এক পাথর পান্ত ভাত দুটো কাঁচা পেঁয়াজ দিয়ে বেড়ে দিত। খেতাম পেট ভরে।

—তার পর বল্—

—সেদিন উপোস করে আছি সারাদিন, ও এসে বললে—

এই পর্যন্ত বলে কাপালী-বৌ লজ্জায় মুখ নিচু করে বললে—না, সে কথা আর—

—কি বললে ?

—চাল দেবো আধ কাঠা।

—তাইতে তুই—

এই পর্যন্ত বলেই অনঙ্গ-বৌ চুপ করে গেল। ওর কাছে এসে ওর হাত ধরে গম্ভীর সুরে বললে—ছুট্‌কি ?

কাপালী-বৌ চুপ করে রইল।

—তুই আমার কাছে গেলি নে কেন ?

—তুমি সেদিনও আমার সঙ্গে শাক তুলে নিয়ে গেছলে। তোমার কাছে কিছু ছিল না সেদিন।

—যেদিন মতি মুচিনী এল ভাতছালা থেকে ?

—হুঁ।

অনঙ্গ-বৌয়ের চোখ ছলছল করে এল। সে আর কিছু না বলে কাপালী-বৌয়ের ডান হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিলে।

দুর্গা পণ্ডিত এসে আড় হয়ে শুয়ে পড়েছিল ওদের দাওয়ায়। বাড়ীতে কেউ ছিল না, গঙ্গাচরণ পাঠশালায়, ছেলেরা কোথায় বেরিয়েছিল। অনঙ্গ-বৌ শাক তুলে বাড়ী ফিরে এসে দেখে প্রমাদ গনলো। আজই দিন বুঝে! শুধু এই শাক ভরসা, দুটো কটা মোটা নাগরা চাল কোথা থেকে উনি ওবেলা এনেছিলেন, তাতে একজনেরও পেট ভরবে না।

দুর্গা পণ্ডিত বললেন—এসো মা। তোমার বাড়ী এলাম।

—বসুন, বসুন।

—তোমাদের সব ভালো ?

—এক রকম ওই।

আধঘণ্টা পরে দুর্গা পণ্ডিত হাত-পা ধুয়ে সুস্থ ঠাণ্ডা হয়ে অনঙ্গ-বৌয়ের কাছে তাঁর দুঃখের বিবরণ দিতে বসলেন। যেন অনঙ্গ-বৌ তাঁর বহুদিনের আপনার জন।

অনঙ্গ বললে—তিন দিন খান নি ? বলেন কি ?

—আমিই তো নয়, বাড়ীসুদ্ধ কেউ নয় মা। বলি না খাওয়ার কষ্ট আর সহ্য হয় না, আমার মায়ের কাছে যাই।

—তা এলেন ভালই করেছেন।

অনঙ্গ আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলো আপাতোক বুড়োকে কি দিয়ে একটু জল দেওয়া যায়। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল পুরোনো দুটো চা পড়ে আছে হাঁড়ির মধ্যে পুঁটুলিতে। বললে—একটু চা করে দেবো ?

দুর্গা পণ্ডিত খুশির সংগে বলে উঠলো—আহা, তা হোলে তো খুবই ভালো হোল। কতদিন চা পেটে পড়ে নি।

অনঙ্গ-বৌ চিন্তিত মুখে বললে—কিন্তু নুন-চা খেতে হবে। দুধ নেই।

—তাই দাও মা। লবণ-চা আমি বড্ড ভালবাসি।

শুধু একবাটি নুন-চা। তা ছাড়া অনঙ্গ-বৌয়ের কিছু দেবার উপায়ও ছিল কি ?

রাত্রে গঙ্গাচরণ এসে দুর্গা পণ্ডিতকে দেখে মনে মনে ভারি চটে গেল। স্ত্রীকে বললে—জুটেচে ওটা আবার এসে ?

অনঙ্গ-বৌ রাগের সুরে বললে—জুটেচে। তা কি হবে এখন ?

—চলে যেতে বলতে পারলে না ? কি খেতে দেবে শুনি ?

—তুমি আমি দেবার মালিক ? যিনি দেবার তিনিই দেবেন।

—হ্যাঁ তিনি তো দিলেন দুবেলা। তাহোলে ওকেও তো তিনি দিলেই পারতেন। তোমার কন্ধে নিয়ে এসে চাপালেন কেন ?

—ছিঃ, অমন বলতে নেই তাঁর নামে। তিনি ঠিক জোটাবেন। এখানে যিনি পাঠিয়েচেন, এও তাঁর কাজ। যোগাবেন তিনি।

—বেশ, যোগান তবে। দেখি বসে বসে।

—নাও, হাত-পা ধুয়ে—এখন নুন-চা খাবে একটু?

দুর্গা পণ্ডিত বেশ শেকড় গেড়ে বসে গেল সেদিন থেকে, মনে হোল গঙ্গাচরণের। মনে মনে বিরক্ত হলেও গঙ্গাচরণ মুখে কিছু বলতে পারে না। দেখতে দেখতে তিন দিন দিব্যি কাটিয়ে দিলে। অনঙ্গ-বৌয়ের আশ্রিত জীব, কোথা থেকে এনে যে ওকে অনঙ্গ-বৌ খাওয়ায়, কেউ বলতে পারে না।

সেদিন দুর্গা পণ্ডিতকে বসে সামনের বেড়া বাঁধতে দেখে গঙ্গাচরণ বিরক্ত হয়ে বললে—ও কাজ করতে আপনাকে কে বলেচে?

দুর্গা পণ্ডিত থতমত খেয়ে বললে—বসে বসে থাকি, বেড়াটা বাঁধি ভাবলাম।

—না, ও রাখুন। ও আপনাকে করতে হবে না। হাবু বাঁধবে এখন।

—ও ছেলেমানুষ, ও কি পারবে?

—খুব ভাল পারে। আপনার হাতে এখুনি দায়ের কোপ লেগে যাবে। এখন ও রাখুন।

দুর্গা পণ্ডিত একটু কুণ্ঠিত হয়েই থাকে। সংসারের এটা-ওটা করবার চেষ্টা করে, তাতে গঙ্গাচরণ আরও চটে যায়। এর মতলবখানা কি, তাহলে এখানেই থেকে যেতে চায় নাকি? অনঙ্গ-বৌ দিব্যি ওকে চা খাওয়াচ্চে, খাবার যে না খাওয়াচ্চে এমন নয়। স্ত্রীকে কিছু বলতেও সাহস করে না গঙ্গাচরণ।

চালের অবস্থা ভীষণ। এর ওর মুখে শুধু শোনা যাচ্চে চাল কোথাও নেই। একদিন সাধু কাপালী সন্ধান দিলে, কুলেখালিতে এক গোয়ালার বাড়ীতে কিছু চাল বিক্রি আছে। কথাটা গঙ্গাচরণের বিশ্বাস হোল না। তবুও গরজ বড় বালাই, সাধু কাপালী ও সে দুজনে সাত ক্রোশ হেঁটে কুলেখালি গ্রামে উপস্থিত হোল। এদিকে রেল-টেল নেই, বড় বাজার গঞ্জ নেই—চাল থাকতেও পারে বিশ্বাস হোল গঙ্গাচরণের!

খুঁজে খুঁজে সেই গোয়ালা-বাড়ী বারও হোল। ব্রাহ্মণ দেখে গৃহস্বামী ওকে যত্ন করে বসাল, তামাক সেজে নিয়ে এল।

গঙ্গাচরণ বললে—জায়গাটা তোমাদের বেশ।

আসল কথা কিছু বলতে সাহস করচে না, বুক ঢিপ ঢিপ করচে। কি বলে বসে কি জানি! চাল না পেলে উপোস শুরু হবে, সবসুদ্ধু।

গৃহস্বামী বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে ম্যালেরিয়া খুব।

—সে সর্ব্বত্র।

—আপনাদের ওখানেও আছে? নতুন গাঁয়ে বাড়ী আপনার? সে তো নদীর ধারে।

—তা আছে বটে, তবু ম্যালেরিয়াও আছে।

—এদিকে যাচ্ছিলেন কোথায়?

—তোমার এখানেই আসা।

—আমার এখানেই? সে আমার ভাগ্যি। ব্রাহ্মণের পায়ের ধুলো পড়লো। তা কি মনে করে?

—ভয়ে বলবো না নির্ভয়ে বলবো?

—সে কি কথা বাবাঠাকুর। আমাদের কাছে ও কথা বলতে নেই। বলুন কি জন্যে আসা?

—তোমার বাড়ী চাল আছে সন্ধান পেয়ে এসেচি। দিতেই হবে কিছু। না খেয়ে মরচি একেবারে।

গৃহস্বামী কিছুক্ষণ গুম্ হয়ে থেকে বললে—আপনাকে বলেচে কে ?

—আমাদের গ্রামেই শুনেচি।

—বাবাঠাকুর, চাল আমার আছে, মিথ্যে কথা বলবো না। আপনি দেবতা। কিন্তু সে চাল বিক্রি করবার নয়।

—কত আছে বলবে—

—তিন মণ। লুকিয়ে রেখেছিলাম, যেদিন গবর্ণমেন্টের লোক আসে কার ঘরে কত চাল আছে দেখতে, সেদিন মাটির মধ্যে পুঁতে রেখেছিলাম বলে চালগুনো একটু গুমো গন্ধ হয়ে গিয়েচে। ধান নেই, শুধু ওই চাল কটা সম্বল। ও বিক্রি করলি—আমরা কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে ঘর করি,রাগ করবেন না,অভিসম্পাত দেবেন না বাবাঠাকুর। দিতি পারলি দিতাম। ওই কটা চাল ছাড়া আমার আর কোনো সম্বল নেই। ব্রাহ্মণের পায়ে হাত দিয়ে বলচি।

চাল পাওয়া গেল না। ফিরে আসবার পথে গঙ্গাচরণ চোখে অন্ধকার দেখলে। সাধু কাপালীও সঙ্গে ছিল ওর। ক্রোশ দুই এসে ওদের বড় খিদে ও জলতেষ্টা পেলো। সাধু বললে—পন্ডিত মশাই, আর তো হাঁটা যায় না।

—তাই তো দেখছি, কাছে কি গাঁ ?

—চলুন যাই, বামুনডাঙা-শেরপুর সামনে, তার পরে ঝিকরহাটি।

বামুনডাঙা-শেরপুর গ্রামে ঢুকেই ওরা একটা বড় আটচালা ঘর দেখতে পেলে। সাধু কাপালী বললে—চলুন এখানে। ওরা একটু জল তো দেবে।

গৃহস্বামী জাতিতে সদগোপ, ওদের যত্ন করে বসালে ; গাছ থেকে ডাব পেড়ে খেতে দিলে। তারপর একটা বাটিতে খানিকটা আখের গুড় নিয়ে এল, জল নিয়ে এল। বললে —এবেলা এখানে দুটো রসুই করে খেয়ে যেতে হবে।

গঙ্গাচরণ আশ্চর্য হয়ে বললে—রসুই ?

—হাঁ বাবাঠাকুর। তবে চাল নেই।

গঙ্গাচরণ আরও আশ্চর্য হয়ে বললে—তবে ?

—বাবাঠাকুর চাল তো অনেকদিনই নেই গাঁয়ে। দিন দশেক থেকে কেউ ভাতের মুখ দেখে নি এখানে।

—তবে কি রসুই করবো ?

—বাবাঠাকুর বলতে লজ্জা করে, কলাই-সেদ্ধ খেয়ে সব দিন-গুজরান করচে। বড়-ছোট সবাই। আপনাকেও তাই দেবো। আর লাউ-ডাঁটা চচ্চড়ি। ভাতের বদলে আজকাল সবাই ওই খাচ্চ এ গাঁয়ে।

সাধু কাপালী তাতেই রাজী। সে বেচারী দুদিন ভাত খায় নি—ওর মুখের দিকে চেয়ে গঙ্গাচরণ বললে—বাপু যা আছে বের করে দাও।

সেদ্ধ কলাই নুন আর লঙ্কা, তার সঙ্গে বেগুনপোড়া। সাধু কাপালী খেয়ে উঠে বললে —উঃ, এতও অদেষ্টে ছিল পন্ডিত মশাই।

গঙ্গাচরণ বললে—একটা হদিস পাওয়া গেল, এ জানতাম না সত্যি বলছি। কিন্তু এ খেয়ে পেটে সইবে কদিন তাই ভাবচি।

সন্ধ্যার দিকে শুধু হাতে গঙ্গাচরণ বাড়ী ফিরলো, কেবল সাধু কাপালী গোটাকতক বেগুন নিয়েচে। সাধু গরীব লোক নয়, তরি-তরকারি বেচে সে হাটে হাটে তিন-চার টাকা উপার্জন করে, কিন্তু টাকা দিয়েও চাল মিলচে কোথায় ?

দুর্গা, অনঙ্গ-বৌ ও ছেলেদের কারো খাওয়া হয় নি। ওদের মুখ দেখে বুঝতে পারলে গঙ্গাচরণ। ও নিজে তবুও যা হোক দুটো কলাই সেদ্ধও খেয়েছে। অনঙ্গ-বৌ স্বামীকে খালি হাতে ফিরতে দেখে চালের কথা কিছু জিজ্ঞেস করলে না। গঙ্গাচরণ হাত-পা ধুয়ে বসলে চা করে ও নিয়ে এল। দুর্গা নিজেও আজ চালের চেষ্টায় বেরিয়েছিল। কোথাও সন্ধান মেলে নি। অনঙ্গ-বৌ ওকে বললে—খাবে এখন ? গঙ্গাচরণ কৌতূহলের সঙ্গে খাবার জায়গায় গিয়ে দেখলে থালার একপাশে শুধু তরকারী, ভাত নেই—খানিকটা বেশি রে মিষ্টি কুমড়ো সেদ্ধ, একটু আখের গুড়। স্ত্রী যেন অন্নপূর্ণা, এও তো কোথা থেকে জাটাতে হয়েচে ওকেই !

গঙ্গাচরণ কিছু ঠিক করতে পারে না ভেবে ভেবে। রোজ রোজ এই খেয়ে মানুষ ক বাঁচে !

স্ত্রীকে বললে—আর এক খাবার দেখে এলুম বামুনডাঙা-শেরপুরে। সেখানে সবাই লাই সেদ্ধ খাচ্চে।—খাবে এক দিন ?

অনঙ্গ-বৌয়ের দিকে চেয়ে ওর মনে হোল এই কদিনে ও রোগা হয়ে পড়েচে। বোধ য় পেট পুরে খেতে পায় না নিজে, আর ওই বুড়োটা এসে এই সময় স্কন্ধে চেপে আছে। ুড়োকে খাওয়াতে গিয়ে ওর নিজের পেটে কিছু যাচ্চে না হয় তো। নাঃ, এমন বিপদেও ড়া গিয়েচে !

অনঙ্গ-বৌ কি বলতে যাচ্ছিল এমন সময় বাইরে থেকে কে বলে উঠলো—ও বামুন-দিদি—

অনঙ্গ-বৌ বাইরে এসে দেখলে ভাতছালার মতি-মুচিনী উঠোনে দাঁড়িয়ে। শরীর ীর্ণশীর্ণ, পরনে উলি-দুলি ছেঁড়া কাপড়, মাথায় রুক্ষ চুল বাতাসে উড়চে।

ওকে দেখে মতি হাসতে গেল। কিন্তু শীর্ণ মুখের সব দাঁতগুলো বেরিয়ে হাসির মাধুর্য গল নষ্ট হয়ে। সর্বপ্রথমে অনঙ্গ-বৌ প্রশ্ন করলে—কে মতি ! খাস নি কিছু ? আয়—বোস।

তারপর দু'মিনিটের মধ্যে দেখা গেল টেমি জেবলে উঠোনে একখানা কলার পাত পতে মতিকে বসিয়ে দিয়ে অনঙ্গ-বৌ ওকে খেতে দিয়েচে, সেই মিঠে কুমড়ো সেদ্ধ আর াউশাক চচ্চড়ি। মতি বললে—দুটো ভাত নেই বামুন-দিদি ? অনঙ্গ-বৌ দুঃখিত হোল।

মতি মুচিনীর মুখে নিরাশার চিহ্ন। ভাত দিতে পারলে না ওর পাতে অনঙ্গ-বৌ। কদানা চাল নেই ঘরে কদিন। এই সব খেয়ে চলচে সবারই। তাও যে মেলে না। উশাক আর কুমড়ো কত কষ্টে যোগাড় করা।

অনঙ্গ-বৌ আদর করে বললে—আর কি নিবি মতি ?

মতি হেসে বললে—মাছ দ্যাও, মুগির ডাল দ্যাও, বড়ি-চচ্চড়ি দ্যাও—

—দেবো, তুই খা খা—হ্যাঁরে ভাত পাস্ নি কদিন রে ?

মতি চোখ নীচু করে কলার পাতার দিকে চেয়ে বললে—পনেরো-ষোল দিন আজ সুদ্ধ সেদ্ধ আর পুঁইশাক সেদ্ধ খেয়ে আছি। আর পারি নে বামুন-দিদি। তাই জোটাতে

পাচ্ছি নে। ভাবলাম আর তো মরেই যাবো, মরবার আগে বামুন-দিদির বাড়ীতে দুটে ভাত খেয়ে আসি।

অনঙ্গ-বৌ চোখের জল মুছে দগ্ধকণ্ঠে বললে—মতি, তুই থাক আজ। ভাত তোে আমি কাল খাওয়াবোই। যেমন করে পারি।

মতি মুচিনীকে দুদিন অন্তর যাহোক দুটি ভাত দেয় অনঙ্গ-বৌ।

কোথা থেকে সে ভাত যোগাড় হয়, তা তাকে কেউ জিজ্ঞেস করে না। দুর্গা বড়ে বাড়ী গিয়েচে কামদেবপুরে, কিন্তু গঙ্গাচরণের দৃঢ়বিশ্বাস, ও ঠিক আবার এসে জুটবে। বাজারে এমন নির্ভাবনায় আহার জুটবে কোথা থেকে ?

সেদিন মতি দুপুরে এসে হাজির। ওর পরনে শতচ্ছিন্ন কাপড়, মাথায় তেল নেই অনঙ্গ-বৌ ওকে বললে—মতি তেল দিচ্চি, একটা ডুব দিয়ে আয় দিকি !

—পেট জ্বলচে বামুন-দিদি। কাল ভাত জোটে নি, নেয়ে এলেই পেটে আগুন জ্বলে উঠবে।

—তুই যা, সে ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না।

মতি মুচিনী নির্বোধ মেয়ে নয়, সে চুপ করে থেকে বললে—না, তোমাদের এখানে আর খাবো না।

—কেন রে ?

—তুমি পাবে কোথায় বামুন-দিদি যে রোজ রোজ দেবে ?

—সে ভাবনা তোর নয়, আমার। তুই যা দিকি, নেয়ে আয়—

মতি মুচিনী স্নান সেরে এল। একটা কলার পাতে আধপোয়াটাক কলাইসিদ্ধ ও কিসের চচ্চড়ি। অনঙ্গ-বৌ ধরা গলায় বললে—ওই খা মতি।

মতি অবাক হয়ে একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে বললে—তোমাদেরও এই শুরু হোয়েচে ?

—তা হয়েচে।

—চাল পেলে না ?

—পঞ্চান্ন টাকা মণ। দাম দিলে এখুনি মেলে হয়তো।

—কিন্তু এ তোমরা খেয়ো না বামুন-দিদি।

—কেন রে ?

—এ কি তোমাদের পেটে সহ্যি হয় ? আমাদের তাই সহ্যি হয় না।

—তুই খা খা—এত বক্তিমে দিতে হবে না তোকে।

বিকেলে মতি এসে বললে—বামুন-দিদি, এক জায়গায় মেটে আলু আর বুনো শোল কচু হয়েচে জঙ্গলের মধ্যে। একটা শাবলটাবল দ্যাও, কেউ এখনো টের পায় নি, তুলে আনি

অনঙ্গ-বৌ বললে—তুই একলা পারবি আলু তুলতে ?

—কেন পারবো না ? দ্যাও একখানা শাবল—

—খাস নি, দুর্বল শরীর, ভিরমি লেগে পড়ে যাবি। তুই আর আমি যাই—

এই সময় কাপালীদের ছোট-বৌ এসে জুটলো। বললে—কি পরামর্শ হচ্চে তোমাদের গা অতএব ছোট-বৌকেও ওদের সঙ্গে নিতে হোল।

গ্রামের উত্তর মাঠের নিচেই সবাইপুরের বাঁওড়। বাঁওড়ের ধারে খুব জঙ্গল। জঙ্গলে

ধ্যে একটা শিমুলগাছ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে! ষাঁড়াগাছের দুর্ভেদ্য ঝোপের মধ্যে মাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হয়।

ওরা এগিয়ে গিয়েচে অনেকখানি। কিন্তু অনঙ্গ-বৌ আর কাপড় ছাড়াতে পারে না। ক বিশ্রী কাঁটা।

মতি মুচিনী বিরক্ত হয়ে বললে—তখুনি বললাম তুমি এসো না। এখানে আসা কি তামার কাজ? কক্ষনো কি এসব অভ্যেস আছে তোমার? সরো দেখি—

মতি এসে কাঁটা ছাড়িয়ে দিলে।

অনঙ্গ-বৌ রাগ করে বললে—ছুঁলি তো এই সন্দেবেলা?

মতি হেসে বললে—নেয়ে মরো এখন বামুন-দিদি।

—যা যা, আর মজা দেখতে হবে না তোমার—ঢের হয়েচে।

আরও এক ঘণ্টা কেটে গেল। মস্ত বড় মেটে আলু লতার গোড়া খুঁড়ে সের পাঁচ-ছয় জনের বড় আলুটা তুলতে ওরা সবাই ঘেমে নেয়ে উঠেচে। মতি মুচিনী মাটি মেখে ভূত য়েচে, কাপালী-বৌ লতার জঙ্গল টেনে ছিঁড়তে ছিঁড়তে হাত লাল করে ফেলেচে, অনঙ্গ-বৌ কটু আনাড়ির মত আলুর একদিক ধরে বৃথা টানাটানি করচে গর্ত থেকে সেটাকে তুলবার।

কাপালী-বৌ হেসে বললে—রাখো, রাখো বামুন-দিদি, ও তোমার কাজ নয়। দাঁড়াও কপাশে—

বলে সে এসে দু'হাত দিয়ে টানতেই আলুটা গর্ত থেকে বেরিয়ে এল।

অনঙ্গ-বৌ অপ্রতিভের হাসি হেসে বললে—আমি পারলাম না—বাবাঃ—

—কোথা থেকে পারবে বামুন-দিদি—নরম রাঙা হাতের কাজ নয় ওসব।

—তুই যা—তোকে আর ব্যাখ্যান কত্তে হবে না মুখপুড়ী—

এমন সময় এক কাণ্ড ঘটলো। সেই ঘন ঝোপের দূর প্রান্তে একজন দাড়িওয়ালা য়ান মত চেহারার লোকের আকস্মিক আবির্ভাব হোল। লোকটা সম্ভবতঃ মেঠো পথ য়ে যেতে যেতে নদীতীরের ঝোপের মধ্যে নারীকণ্ঠের হাসি ও কথাবার্তা শুনতে পেয়ে দকে এসেচে। কিন্তু তার ধরনধারণ ও চলনের ভঙ্গি, চোখের দৃষ্টি দেখে সর্বপ্রথমে অনঙ্গ-য়ের মনে সন্দেহ জাগল। ভাল নয় এ লোকটার মতলব। ঝোপের মধ্যে তিনটি সম্পূর্ণ পরিচিতা মেয়েকে দেখেও ও কেন এদিকেই এগিয়ে আসচে? যে ভদ্র হবে, সে এমন ভুত আচরণ কেন করবে?

মতি এগিয়ে এসে বললে—তুমি কে গা? এদিকি মেয়েছেলে রয়েচে—এদিকি কেন আসচো?

কাপালী-বৌও জনান্তিকে বললে—ওমা, এ ক্যানধারা নোক গা?

লোকটার নজর কিন্তু অনঙ্গ-বৌয়ের দিকে, অন্য কোনদিকে তার দৃষ্টি নেই। সে হনু করে সোজা চলে আসচে অনঙ্গ-বৌয়ের দিকে। অনঙ্গ-বৌ ওর কাণ্ড দেখে ভয়ে জড়সড় য় মতির পেছন দিকে গিয়ে দাঁড়ালো। তার বুক ঢিপ ঢিপ করচে—ছুটে যে একদিকে লাবে এ তেমন জায়গাও নয়। তখনও লোকটা থামে নি।

মতি চেঁচিয়ে উঠে বললে—কেমন নোক গা তুমি? ঠেলে আসচো যে ইদিকে বড়ো?

কাপালী-বৌ এসময়ে আরও পিছিয়ে গিয়েছে। কারণ কাছাকাছি এসে লোকটা ওর দিকেও বার কটমট করে চেয়েচে—মুখে কিন্তু লোকটা কোন কথা বলে নি।

এদিকে অনঙ্গ-বৌয়ের মুশকিল হয়েচে, ছুটে পালাতে গিয়ে ওর চুল জড়িয়ে গিয়েচে শেয়াকুল কাঁটায় আর কুঁচ লতায়। বসন হয়ে গেছে বিস্রস্ত। ঘামে ও পরিশ্রমে মুখ হয়েচে রাঙা। লোকটা ওর দিকে যেন অগ্নিশিখার দিকে পতঙ্গের মত ছুটে আসচে—কাছে এসে যেমন খপ করে অনঙ্গ-বৌয়ের হাত ধরতে যাবে, মতি তাকে প্রাণপণ শক্তিতে মারলে এক ঠ্যালা। সঙ্গে সঙ্গে অনঙ্গ-বৌ বলে উঠলো—খবরদার! কাপালী-বৌ হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো।

লোকটা ধাক্কা খেয়ে মেটে আলুর গর্তের মধ্যে পড়ে গেল।

ততক্ষণ মতি এসে অনঙ্গ-বৌকে কাঁটার বাঁধন থেকে মুক্ত করবার প্রাণপণে চেষ্টা করচে তার তখন রণরঙ্গিণী মূর্তি। সে চেঁচিয়ে বললে—তোল্ তো শাবলটা কাপালী-বৌ—মিনসের মুণ্ডুটা দিই গুঁড়ো করে ভেঙে—এত বড় আস্পদ্দা!

অনঙ্গ-বৌ ঝাঁড়াঝোপের নিবিড়তম অংশে ঢুকে গিয়েচে ততক্ষণ, ও ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপচে। কারণ ঝোপ থেকে বেরুবার পথ নেই বাইরে, সে সুঁড়ি পথটাতে ওর আর মতির যুদ্ধ চলছিল। লোকটা গর্ত থেকে উঠবার চেষ্টা করচে, মতি কাপালী-বৌয়ের হাত থেকে শাবলটা নিচ্চে—এই পর্যন্ত অনঙ্গ-বৌ দেখতে পেল। পালাবার পথ বন্ধ। অনঙ্গ-বৌ যেখানে ঢুকেচে সেখানে মানুষ আসতে হোলে তাকে হামাগুড়ি দিয়ে চার হাতে-পায়ে আসতে হবে। বিষম কুঁচ কাঁটার লতাজাল। মাথার ওপর শাবল হাতে মতি মুচিনী রণরঙ্গিণী মূর্তিতে দাঁড়িয়ে।

লোকটা নিজের অবস্থা বুঝল। মতির হাত থেকে শাবল কেড়ে নেওয়া অত সহজ হবে না।

এদিক-ওদিক চেয়ে সে সে-পথেই এক-পা দু-পা করে পিছু হঠতে লাগলো।

একেবারে ঝোপের প্রান্তসীমায় পৌঁছে লোকটা হঠাৎ পিছন ফিরে দিলে দৌড়। মতি মুচিনী বললে—বেরিয়ে এসো গো বামুনদিদি—পোড়ারমুখো মিনসে ভয় পেয়ে ছুট দিয়েচে।

অনঙ্গ-বৌ তখনও কাঁপছে, তার ভয় তখনও যায় নি। কাপালী-বৌ ভয় পেলেও অনঙ্গ-বৌয়ের মত ভয় পায় নি বা তার অতটা ভয় পাওয়ার কারণও ঘটে নি। সে হেসে ফেললে।

অনঙ্গ-বৌ ধমক দিয়ে বললে—আবার হাসি আসচে কিসে পোড়ারমুখে?—চুপ, ছুঁড়ির রঙ্গ দ্যাখো না—

মতি মুচিনী বললে—ওই বোঝো।

সবাই মিলে এমন ভাবটা করলে যেন সব দোষটা ওরই।

কাপালী-বৌয়ের বয়স কম, সমস্ত ব্যাপারটা তার কাছে কৌতুকজনক মনে না হলে সে হাসে নি—হাসি চাপবার চেষ্টা করতে করতে বললে—ওঃ, মতি-দিদির সে শাবল তোলার ভঙ্গি, দেখে আমার তো—হি-হি-হি—

অনঙ্গ-বৌ ধমক দিয়ে বললে—আবার হাসে!

—নাও, নাও, বামুন-দিদি আর রাগ কোরো না—

—হয়েচে। এখন চলো এখান থেকে বেরিয়ে—বেলা নেই।

এতক্ষণ ওদের যেন সেদিকে দৃষ্টি ছিল না—এখন হঠাৎ ঝোপ থেকে উঁকি মেরে সবাই চেয়ে দেখলে সবাইপুরের বাঁওড়ের ওপারে নোনাতলা গ্রামের বাঁশবনের আড়ালে কতক্ষণ

পূর্বে সূর্য অস্ত গিয়েচে, ঘন ছায়া নেমে এসেচে বাঁওড়ের তীরে তীরে, বাঁওড়ের জলের কচুরি-পানার দামের ওপর। আবার কি উৎপাত না জানি হয়, সন্ধ্যেবেলা। মাত্র তিনটি মেয়েছেলে তেপান্তর মাঠের মধ্যে।

অনঙ্গ-বৌ বললে—বাবাঃ—এখন বেরোও এখান থেকে।

মতি বললে—বা রে, মেটে আলুটা ?

—কি হবে তাই ?

—অত বড় মেটে আলুটা ফেলে যাবা ? কাল থাকবে ? এই মন্বন্তরের সময় ?

কথাটা সকলেরই প্রাণে লাগলো। থাকবে না মেটে আলু। আজকাল গ্রামের লোক সব যেন কেমন হয়ে উঠেছে। সন্ধান পাবেই।

কাপালী-বৌ বললে—তাই করো বামুন-দিদি। আলুটা নেওয়া যাক—লোক সব হন্যে হয়ে উঠেচে না খেতি পেয়ে। বুনো কচু আলু কিছু বাদ দিচ্চে না, সর্বদা খুঁজে বেড়াচ্চে বনে জংগলে। ওই আলুটা তুললে আমাদের তিন বেলা খাওয়া হবে।

আবার সবাই মিলে আলুর পিছনে লাগলো এবং যখন সকলে মিলে গর্ত হতে মেটে আলুটা বের করে উপরে তুলে ধুলো ঝাড়ছে—তখন সন্ধ্যার পাতলা অন্ধকার মাঠ-বন ঘিরে ফেলেছে। মতি মুচিনী নিজেই অত বড় ভারি আলুটা নিয়ে চললো, মধ্যে অনঙ্গ-বৌ, পেছনে শাবল হাতে কাপালী-বৌ। ওরা সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে চারিদিকে সশঙ্ক দৃষ্টিতে চাইতে চাইতে গ্রামের মধ্যে এসে ঢুকলো।

গ্রামে ঢুকবার আগে অনঙ্গ-বৌ বললে—এই ছুঁড়ি, আজকের কথা ওই সব যেন কাউকে বলিস নে—

কাপালী-বৌ ঘাড় নেড়ে বললে—নাঃ—

—বড্ড পেট-আলগা তুই, পেটে কোনো কথা থাকে না—

—কেন, কবে আমি কাকে কি বলিচি ?

—সে হিসেব এখন বসে বসে দেবার সময় নেই—মোটের ওপর একথা কারো কাছে—

—কোন্ কথা ? মেটে আলুর কথা ?

—আবার ন্যাকামি হচ্চে ? দ্যাখ ছুঁড়ি, তুই কিন্তু দেখবি মজা আমার হাতে আজ। তুমি বুঝতে পারচো না কোন্ কথা ? নেকু !

কাপালী-বৌ আবার হি-হি করে হেসে ফেললে—কি কারণে কে জানে।

অনঙ্গ-বৌ বললে—এ পাগলকে নিয়ে আমি এখন কি করি ? তুই বলবি ঠিক—না ?

কাপালী-বৌ হাসি থামিয়ে আশ্বাস দেওয়ার সুরে বললে—পাগল বামুন-দিদি ? তোমার নিয়ে যখন কথা, তখন জেনো, কাগ-পক্ষিতেও একথা টের পাবে না। মাথার ওপর চন্দ্র-সূর্যি নেই ?

বাড়ী এসে আলুর ভাগ নিয়ে চলে গেল যে যার ঘরে।

গঙ্গাচরণ বেরিয়েছিল চাল যোগাড়ের চেষ্টায়। কিন্তু ন হাটার হাটে ঘোর দাঙ্গা আর লুটপাট হয়ে গিয়েচে—চালের দোকানে। পুলিস এসে অনেক লোককে ধরে নিয়ে গিয়েচে। গঙ্গাচরণ বর্ণনা করে স্ত্রীর কাছে বসে সন্ধ্যার পরে।

অনঙ্গ-বৌ বললে—এখন উপায় ?

—উপবাস।

অনঙ্গ-বৌ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভাবলে সে উপোস করতে ভয় খায় না, উপোস কি করে নি এর মধ্যে? কিন্তু এই যে উনি শুকনো মুখে এত দূর থেকে এসেছেন ফিরে, ওঁকে এখন সে কি খেতে দেবে এই মেটে আলু সিদ্ধ ছাড়া? বাধ্য হয়ে দিতে হোল তাই। শুধু মেটে আলু সিদ্ধ। এক তাল মেটে আলু সিদ্ধ। সবাইকে তাই খেতে হোল। দুর্গা পণ্ডিত সম্প্রতি বাড়ী চলে গিয়েচে। তবুও আলু সেদ্ধ খানিকটা বাঁচবে। হাবু খেতে বসে বললে—এ মুখে ভাল লাগে না মা—

অনঙ্গ বললে—এ ছেলের চাল দ্যাখ না? মুখে ভাল না লাগলে করচি কি?

মতি মুচিনী খেতে এল না, কারণ সে ভাগের ভাগ আলু নিয়ে গিয়েচে, আলাদা করে আলু সেদ্ধ বা আলু পোড়া খেয়েচে।

পরদিনও আলু সেদ্ধ চললো। এ কি তাচ্ছিল্যের দ্রব্য? কত বিপদের সম্মুখীন হয়ে তবে ওইটুকু আলু সংগ্রহ করে আনতে হয়েচে—ছেলের মুখে ভালো লাগে না তো সে কি করবে?

রাত্রিতে অনঙ্গ-বৌ বললে—হ্যাঁগা, চাল না পাও, কিছু কলাই আজ আনো। আলু ফুরিয়েছে।

—তাই বা কোথা থেকে আনি?

—পরামাণিকদের দোকানে নেই?

—সব সাবাড়। গুদোম সাফ।

—কি উপায়?

—কিছু নেই ঘরে? আলুটা?

—সে আর কতটুকু। কাল ফুরিয়েচে। তবুও তো এবার পণ্ডিত ঠাকুর নেই—মতি নেই—নিজেরাই খেয়েছি।

—কাল থেকে কি হবে তাই ভাবচি—

—চাল কোথাও নেই?

—আছে। পঁয়ষট্টি টাকা মণ, নেবে? পারবে নিতে?

অনঙ্গ-বৌ হেসে বললে—আমার হাতের একগাছা রুলি আছে, তাই বেচে চাল নিয়ে এসো।

তিন দিন কেটে গেল।

চাল তো দূরের কথা কোন খাবারই মেলে না। কলাইয়ের মণ ষোল টাকা, তাও পাওয়া দুষ্কর।

কাপালী-বৌ না খেয়ে রোগা হয়ে গিয়েচে, তার চেহারার আগের জলুস আর নেই সন্ধ্যাবেলা পা টিপে টিপে অনঙ্গ-বৌয়ের কাছে এসে বললে—কি করচো বামুন-দিদি?

—বসে আছি ভাই, রান্না-বান্না তো নেই।

—সে তো কারো নেই।

—কি খেয়েছিস? সত্যি বলবি?

কাপালী-বৌ চুপ করে রইল।

অনঙ্গ-বৌ ঘরের মধ্যে গিয়ে এদিক-ওদিক খংজলো। কিছ্ই পেলে না। তার ধারণা ছিল কাল রাতের আধখানা নারকোল বোধ হয় ঘরের কোথাও আছে। কিন্তু খিদের জ্বালায় ছেলেরা বোধ হয় কখন শেষ করে দিয়েচে, সে দেখে নি।

কাপালী-বৌ ওর দিকে চেয়ে রইল অদ্ভুত দৃষ্টিতে। ওকে দেখে কষ্ট হয়।

একটু কাছে ঘেঁষে এসে বললে—আজ যাবো।

অনঙ্গ-বৌ বিস্ময়-সুরে বললে—কোথায় যাবি ?

—ইটখোলায়।

—কোন্ ইটখোলায় ?

—দীঘির পারের বড় ইটখোলায়—জানো না ? আহা !

কাপালী-বৌ যেন ব্যঙ্গের সুরে কথা শেষ করলে।

অনঙ্গ-বৌ বললে—সেখানে কেন যাবি রে ?

কাপালী-বৌ চুপ করে রইল নিচু-চোখে। অনঙ্গ-বৌ বললে—ছুট্‌কি !

—বলো গে তুমি বামুন-দিদি। তোমার মুখের দিকে চেয়ে আমি এতদিন জবাব দিই নি। আর পারি নে না খেয়ে—না খেয়েই যদি মলাম, তবে কিসের কি ? আমি কোনো কথা শুনবো না—চলি বামুনদি, পাপ হয়ে নরকে পচে মরবো সেও ভালো—

অনঙ্গ কোনো কথা বলবার আগে কাপালী-বৌ ততক্ষণ হন্ হন্ করে চলেচে বেড়ার বাইরের পথে।

অনঙ্গ-বৌ পিছনে ডাক দিলে—ও বৌ শুনে যা, যাস নি,—শোন্ ও বৌ—

পুরোনো ইটখোলার এদিকে একটা বড় শিমুল গাছের তলায় অন্ধকারে কে একজন দাঁড়িয়ে। কাপালী-বৌ আনাড়ির মত অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে পথ চলে সেখানে পেঁছুলো।

দাঁড়িয়ে আছে পোড়া-যদু—বাল্যে সর্বাঙ্গ পুড়ে গিয়েছিল, এখনও সে দাগ মেলায় নি—; তাই ওর ওই নাম গ্রামের মধ্যে। পোড়া-যদুও বলে, আবার যদু-পোড়াও বলে। যদু ইটখোলায় কাঠ যোগান দেওয়ার ঠিকাদার। মোটা পয়সা রোজগার করে।

যদু-পোড়া ওকে দেখতে পেয়ে বললে—এই যে, ইদিকি !

কাপালী-বৌ ভেংচি কেটে বললে—ইদিকি ! দেখতি পেইচি। এ অন্ধকারে আর ও ভুতের রূপ চোখ মেলে দেখতি চাইনে। আঁতকে ওঠবো।

যদু-পোড়া শ্লেষের সুরে বললে—তবু ভালো। তবুও যদি—

কাপালী-বৌ বাধা দিয়ে না থামিয়ে দিলে যদু-পোড়া একটা কি অশ্লীল কথার দিকে ঝুঁকেছিল।

থামিয়ে দিয়ে নীরস রুক্ষসুরে বলে—কই চাল ?

—আছে রে আছে—

—না, দেখি আগে। কত কটি ?

—আধ পালি। তাই কত কষ্টে যোগাড় করা। শুধু তোকে কথা দিইচি বলে।

—কে তোমার কাছে কথা পেড়েছিল আগে ? আমার কাছে তুমি কখন কথা দিইছিলে ? বাজে কথা কেন বলো ? আমি দেরি করতে পারবো না—সন্দে হয়ে গিয়েচে—দেখি চাল আগে—তোমাকে আমার বিশ্বাস নেই—

যদ্ব-পোড়া নিজের সততার প্রতি এ রূঢ় মন্তব্যে হঠাৎ বড় অবাক হয়ে উঠে কি একটা প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল, কাপালী-বৌ আবার ধমক দিয়ে বলে উঠলো—আমি চলে যাচ্ছি কিন্তু। সারারাত এ শিমুল তলায় তোমার মত শ্মশানের পোড়া কাঠের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে নাকি ? চললাম আমি—

যদ্ব-পোড়া ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বললে—শোন্ শোন্ যাস নে—বাবাঃ, এ দেখচি ঘোড়ায় জিন দিয়ে—আচ্ছা আচ্ছা—এই দ্যাখ চাল—এই ধামাতে—এই যে—বাপ রে, কি তেজ !

কাপালী-বৌ সদর্পে বললে—চুপ !

—আচ্ছা, আচ্ছা, কিছু বলচি নে—তাই বলচি যে—

কাপালী-বৌ আধঘণ্টা পরে ইটখোলা থেকে বেরুলো, আঁচলে আধ পালি চাল ! পেছনে পেছনে আসছে যদ্ব-পোড়া। অন্ধকার পথের দু'ধারে আশ-সেওড়া বনে জোনাকি জ্বলচে

কাপালী-বৌ তিরস্কারের সুরে বললে—পেছনে পেছনে কোন্ যমের বাড়ী আসচো ?

—তোকে একটু এগিয়ে দি—

—ঢের হয়েচে। ফিরে যাও—

—অন্ধকারে যাবি কি করে ?

—তোমার সে দরদে কাজ নেই—চলে যাও—

—গাঁয়ের লোক এ পথে আসবে না, ভয় নেই—

—সে ভয় করি নে আমি। আমাকে সবাই চেনে—তুমি যাও চলে—

তবুও যদ্ব-পোড়া পিছু পিছু আসচে দেখে কাপালী-বৌ হঠাৎ দাঁড়িয়ে ঝাঁঝের সুরে বললে —যাও বলচি—কেন আসচো ?

যদ্ব-পোড়া আদরের সুরে বললে—তুমি অমন করচো কেন হ্যাঁগো। বলি আমি কি পর ?

কাপালী-বৌ নীরস কণ্ঠে বললে—ওসব কথায় দরকার নেই। তোমাকে উপকার করতে কেউ বলচে না, যাও বলচি, নইলে এ চাল সব ওই খানায় ফেলে দেবো কিন্তু।

যদ্ব-পোড়া এবার থমকে দাঁড়ালো। বললে—যাচ্চি, যাচ্চি—একটা কথা—

—কি কথা ?

—চাল আর কিছু আমি যোগাড় করচি—পরশু সন্দেবেলা আসিস।

—যাও তুমি—

অনঙ্গ-বৌ রান্নাঘরের দাওয়ায় আঁচল পেতে শুয়ে আছে, গঙ্গাচরণ কোথায় বেরিয়েচে এখনো ফেরে নি। আধ-অন্ধকারে কে একজন দাওয়ার ধারে খুঁটি ধরে এসে দাঁড়ালো। অনঙ্গ-বৌ চমকে বলে উঠলো—কে ?

পরে ভাল করে চেয়ে দেখে বললে—আ মরণ ! মুখে কথা নেই কেন ?

কাপালী-বৌ মুখে আঁচল দিয়ে খিল খিল করে হাসচে।

অনঙ্গ-বৌ বললে—কি মনে করে ?

—একটু নুন দেবা ?

—দেবো। কোত্থেকে এলি ?

—এলাম।

—বোস না—

—বোসবো না। খিদে পাই নি?

—খাবি কি?

কাপালী-বৌ আঁচল দেখিয়ে বললে—এই যে।

—কি ওতে?

—চাল—দেখতি পাচ্চ না? নুন দ্যাও দিদি। খাই গিয়ে—

—কোথায় পেলি চাল?

—বলবো কেন? তুমি দুটো রাখো বামুন-দিদি।

অনঙ্গ-বৌ গম্ভীর সুরে বললে—ছুটকি তোর বড় বাড় হয়েচে। যত বড় মুখ না তত বড় কথা—

—পায়ে পড়ি বামুন-দিদি! নাও দুটো চাল তুমি—

—তোর মুখে আগুন দেবো—

—আচ্ছা বামুন-দিদি, আমরা নরকে পচে মরবো ঠিকই। আমাদের কথা বাদ দাও তুমি। তুমি সতীলক্ষ্মী, পায়ের ধুলো দিও—নরকে গিয়েও যাতে দুটো খেতি পাই—

অনঙ্গ-বৌয়ের চোখে জল এল। সে কোনো কথা না বলে চুপ করে রইল।

কাপালী-বৌ বললে—নেবা দুটো চাল?

—না, তুই যা—

—তবে মর গিয়ে। আমিই খাই গিয়ে। কই নুন দ্যাও—

নুন নিয়ে চলে গেল কাপালী-বৌ। কিছুদূর গিয়ে আবার ফিরে এসে বললে, ও বামুন-দিদি, আজ তুমি কি খেয়েচ?

—ভাত।

—ছাই—সত্যি বলো!

—যা খাই তোর কি? যা তুই—

কাপালী-বৌ এগিয়ে এসে বললে—পায়ের ধুলো একটু দ্যাও—গঙ্গা নাওয়ার কাজ হয়ে যায়—

বলেই সে অনঙ্গ-বৌয়ের দুই পায়ের ধুলো দুই হাতে নিয়ে মাথায় দিলে। তারপর কি একটা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময়ে গঙ্গাচরণ এসে পড়াতে সে ছুটে পালালো।

গঙ্গাচরণ বললে—ও কে গেল গা?

—ছোট-বৌ কাপালীদের।

—কি বলছিল?

—দেখা করতে এসেছিল। চাল পেলে?

—এক জায়গায় সন্ধান পেয়েচি। ষাট টাকা মন—ভাবচি কিছু বাসন বিক্রি করি।

—তাতে ষাট টাকা হবে?

—কুড়ি টাকা তো হবে। তেরো সের চাল কিনে আনি—আর না খেয়ে তো পারা যায় না, সত্যি বলচি—

—তার চেয়ে আমার সোনা-বাঁধানো শাঁখাটা বিক্রি করে এস। বাসন থাক গে—

—তোমার হাতের শাঁখা নেবো?

—না নিলে অনাহারে মরতে হবে। যা ভালো বোঝো তাই করো।

পরদিন গঙ্গাচরণ শাঁখাজোড়া গ্রামের সর্ব স্যাকবার দোকানে বিক্রি করলে। সর্ব স্যাকরা বললে—এ জিনিস বিক্রি করবেন কেন ?

—দরকার আছে।

কিন্তু চাল পাওয়ার যে এত বিপুল বাধা তা গঙ্গাচরণ জানতো না। শঙ্করপুরের নিবারণ ঘোষের বাড়ী চালের সন্ধান একজন দিয়েছিল। খুব ভোরে পরদিন উঠে সেখানে পৌঁছে দেখলে দশজন লোক সেখানে ধামা নিয়ে বসে। বাড়ীর মালিক তখনো ওঠে নি। নিবারণ দোর খুলে বাইরে আসতেই সবাই মিলে তাকে ঘিরে ধরলে। সে বললে—আমার চাল নেই—

গঙ্গাচরণ বললে—সে আমি জানি। তবুও তোমার মুখে শুনবো বলে এসেছিলাম—

গঙ্গাচরণ সেখানেই বসে পড়লো। চাল না নিয়ে ফিরবে কেমন করে। বাড়ীর সকলেই আজ দু'দিন থেকে ভাত খায় নি। ছেলেদের মুখের দিকে তাকালে কষ্ট হয়। অন্য কয়েকজন লোক যারা এসেছিল, তারা একে একে সবাই ফিরে গেল। নিবারণ ঘোষ বাইরের বাড়ী আর ভেতর বাড়ীর মধ্যেকার দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

কতক্ষণ পরে নিবারণ ঘোষ আবার বাইরে এল। গঙ্গাচরণকে বসে থাকতে দেখে বললে —বাবাঠাকুর কি মনে করে বসে ? চাল ? সে দিতে পারবো না। ঘরে চাল আছে, সে তোমার কাছে অস্বীকার করতে যাচ্চি নে—শেষে কি নরকে পচে মরবো ? কিন্তু সে চাল বিক্রি করলি এরপর বাচ-কাচ না খেয়ে মরবে যে !

—কত চাল আছে ?

—দু মণ।

—ঠিক ?

—না ঠাকুরমশাই, মিথ্যে বলবো না। আর কিছু বেশী আছে। কিন্তু সে হাতছাড়া করলি বাড়ীসুদ্ধ না খেয়ে মরবে। ট্যাকা নিয়ে কি ধুয়ে খাবো ? ও জিনিস পয়সা দিলি মেলবে না।

গঙ্গাচরণ উঠবার উদ্যোগ করছে দেখে নিবারণ হাত জোড় করে বললে—একটা কথা বলি বাবাঠাকুর। ব্রাহ্মণ মানুষ, এত দূর এয়েচেন চালির চেষ্টায়। আমি চাল দিচ্চি, আপনি আমার বাড়ীতে দুটো রান্না করে খান। রসুই চড়িয়ে দিন গোয়ালঘরে। মাছ পুকুর থেকে ধরিয়ে দিচ্চি, মাছের ঝোল ভাত আর গরুর দুধ আছে ঘরে। এক পয়সা দিতি হবে না আপনার।

গঙ্গাচরণ বললে—না, তা কি করে হয় ? বাড়ীতে কেউ খায় নি আজ দু'দিন। ছেলেপিলে রয়েছে, তা হয় না। তুমি আমাকে রান্নার জন্যে তো চাল দিতেই, আর দুটো বেশী করে দাও। আমি দাম দিয়ে নেবো। ষাট টাকা করেই মণ দেবো, কিছু বেশি না হয় নাও।

নিবারণ কিছুতেই রাজী হোল না। তার ওপর রাগ করা যায় না, প্রতি কথাতেই সে হাত জোড় করে, এখানে বসে খাওয়ার নিমন্ত্রণ তো করে রেখেচেই। গঙ্গাচরণ চলে আসছে, নিবারণ এসে পথের ওপরে আবার তাকে হাত জোড় করে রান্না করে খাওয়ার অনুরোধ জানালে।

গঙ্গাচরণ রাগ করে বললে—আমি কি তোমার বাড়ী খেতে এসেছি? যাও যাও—ওকথা বলো না—

কিন্তু গঙ্গাচরণের মনের মধ্যে আর সে জোর নেই। হঠাৎ তার মনের চক্ষে ভেসে উঠেছে, দিব্যি হিঙের টোপা টোপা বড়ি ভাসচে মাছের ঝোলে, আলু বেগুন, বড় বড় চিংড়ি মাছ আধ-ভাসা অবস্থায় দেখা যাচ্চে বাটির ওপর। ভাতে সেই মাছের ঝোল মাখা হয়েচে। কাঁচা ঝাল একটা বেশ করে মেখে…

নিবারণ বললে—আসুন, চলুন। আমার একথা আপনাকে রাখতেই হবে। সে শোনবো না আমি। দুপুরবেলায় না খেয়ে বাড়ী থেকে ফিরে যাবেন?

হাবু ভাত খায় নি আজ দু'দিন। অনঙ্গ-বৌ খায় নি দু'দিনেরও বেশি। ও যে কি খায়-না-খায় গঙ্গাচরণ তার খবর রাখে না। নিজে না খেয়েও সবাইকে যুগিয়ে বেড়ায়। তার খাওয়া কি এখানে উচিত হবে? গঙ্গাচরণ নিবারণকে বললে, আচ্ছা যদি খাই, তবে এক কাঠা চাল দেবে?

—না বাবাঠাকুর। মিথ্যে বলে কি হবে। চাল হাতছাড়া করবো না। আপনি একা এখানে বসে আধ কাঠা চাল রেঁধে খান তা দেবো।

—তোমার জেদ দেখচি কম নয়।

—এই আকালে এমনি করেছে। ভয় ঢুকে গিয়েছে যে সবারই।

—চাল আর যোগাড় করতে পারবে না?

—কোথা থেকে করবো বলুন! কোন মহাজনের ঘরে ধান নেই। বাজারে এক দানা চাল আসে না। আমাদের গেরামের পেছনে একটা বিল আছে জানেন তো? দাসপাড়ার বিল তার নাম। এখন এই তো বেলা হয়েছে, গিয়ে দেখুন সেখানে ত্রিশ-চল্লিশ জন মেয়ে-মানুষ জুটেছে এতক্ষণ। জলে পাঁকের মধ্যি নেমে পদ্ম গাছের মূল তুলছে, গেঁড়ি-গুগলি তুলছে—জল-ঝাঁকির পাতা পর্যন্ত বাদ দেয় না।

—বল কি?

—এই যাবার সময় দেখবেন সত্যি না মিথ্যে। যত বেলা হবে তত লোক বাড়বে, বিলির জল লোকের পায়ে পায়ে ঘোল দই হয়ে যাবে কাদা ঘুলিয়ে। এক-একজন কাদামাখা পেত্নীর মত চেহারা হয়েছে—তবুও সেই কাদা জলে ডুব দিয়ে পদ্মের মূল, গেঁড়ি-গুগলি এসব খুঁজে বেড়াচ্চে। চেহারা দেখলি ভয় হয়। তাও কি পাচ্চে বাবাঠাকুর? বিল তো আর অফুরন্ত নয়। যা ছিল, তিন দিনের মধ্যে প্রায় সাবাড় হয়ে গিয়েচে। এখন মনকে চোখ ঠারা।

—তবে যাচ্ছে কেন?

—আর তো কোথাও কিছু খাবার নেই। যদি তবুও বিলের মধ্যি খুঁজলি পাওয়া যায়। ভেবে দেখুন বাবাঠাকুর, আপনাকে যদি চাল বেচি, তবে একদিন আমার বাড়ীর ঝি-বউদের অমনি করে পাঁক মেখে বিলের জলে নামতে হবে দুটো গেঁড়ি-গুগলি ধরে খাবার জন্যি। চলুন, বাবাঠাকুর, আসুন, দুটো খেয়ে যান। পেট ভর্তি চাল দেবো এখন।

গঙ্গাচরণ ফিরলো। মাছের ঝোল ভাত খেয়ে—গেঁড়ি-গুগলি সেদ্ধ নয়। এখনো এ গ্রামের এ দিনেও ভাত খেতে পাওয়া যাচ্চে। এর পরে আর পাওয়া যাবে কি না কে জানে।

গোয়ালঘর নিকিয়ে পুঁছে দিলে নিবারণের বিধবা বড়মেয়ে ক্ষ্যান্তমণি। কাঠ নিয়ে

এসে এক পাশে রাখলে। গঙ্গাচরণ পুকুরের জলে স্নান করে আসতেই ক্ষ্যান্তমণি তসরের কেটে-কাপড় কুঁচিয়ে হাতে দিলে। রান্নার জন্য কুটনো বাটনা সব ঠিক করে এনে দিলে। একবার হেসে বললে—দাদাঠাকুর, অতটা নুন ? পুড়ে যাবে যে বেন্নন।

—দেবো না ?

—বেন্নন মুখে দিতে পারবেন না। আপনার রসুই করবার অভ্যেস নেই বুঝি ?

—না।

—আপনি বসে বসে রাঁধুন, আমি দেখিয়ে দিচ্চি।

ক্ষ্যান্তমণি যে বেশ ভাল মেয়ে, গঙ্গাচরণ অল্প সময়ের মধ্যেই তা বুঝতে পারলে। কোথা থেকে একটু আখের গুড় গাওয়া ঘি যোগাড় করে নিয়ে আসে। যাতে গঙ্গাচরণের খাওয়াটা ভাল হয়, সেদিকে খুব লক্ষ্য। খেতে বসে গঙ্গাচরণের কিন্তু ভাত যেন গলা দিয়ে নামে না—আশ্চর্যের কথা, হাবুর জন্যে দুঃখ নয়, পটলার জন্যেও নয়—দুঃখ হোল অনঙ্গ-বৌয়ের জন্যে। সে আজ দুদিন খায় নি। তার চেয়ে হয়তো আরও বেশি দিন খায় নি। মুখ ফুটে তো কোনো দিন কিছু বলে না।

—আর একটু আখের গুড় দি ?

—না। এ দুধ তো খাঁটি, গুড় দিলে সোয়াদ নষ্ট হয়ে যাবে।

এমন ঘন দুধের বাটিতে হাত ডুবিয়ে সে খাচ্চে এখানে, ওখানে অনঙ্গ-বৌ হয়তো উঠোনের কাঁটানটের শাকের বনে চুবড়ি নিয়ে ঘুরচে, অখাদ্য কাঁটানটে শাক তুলবার জন্যে। নইলে বেলা হোতে না হোতে পাড়ার ছেলেমেয়েরা এসে জুটবে। তাদের উৎপাতে গাছের পাতাটি থাকবার জো নেই।

ক্ষ্যান্তমণি পান আনতে গেল। পাতে দুটি ভাত পড়ে আছে—গঙ্গাচরণের প্রবল লোভ হোল ভাত দুটি সে বাড়ী নিয়ে যায়। কিন্তু কি করে নিয়ে যাবে ? চাদরের মুড়োয় বেঁধে ? ছিঃ—সবাই টের পাবে। এঁটো ভাত ব্রাহ্মণ হয়ে চাদরের মুড়োয় বেঁধে নেবে ?

গঙ্গাচরণ বসে বসে মতলব ভাঁজতে লাগলো। কি করা যাবে ? বলা যাবে কি এই ধরনের যে, আমাদের বাড়ি একটা কুকুর আছে তার জন্যে ভাত কটা নিয়ে যাবো ! তাতে কে কি মনে করবে ? বড় লজ্জা করে যে। অনেকগুলো ভাত নয় বটে, তবুও চার-পাঁচ গ্রাস হবে অনঙ্গ-বৌয়ের। বড় বড় চার-পাঁচ গ্রাস। নিয়ে যাবেই সে। কিসের লজ্জা ? এমন সময়ে ক্ষ্যান্তমণি এসে পান দিতেই ওর মুখের দিকে চেয়ে গঙ্গাচরণের সাহস চলে গিয়ে রাজ্যের লজ্জা ও সঙ্কোচ এসে জুটলো। দিব্বি সুন্দরী মেয়ে, যৌবন-পুষ্ট দেহটির দিকে বার বার চেয়ে দেখেও আশ মেটে না। কালো চুল মাথায় একতাল, নাকের ডগায় একটা ছোট্ট তিল। মুখে দু-দশটা বসন্তের দাগ আছে বটে, তবুও ক্ষ্যান্তমণির সুশ্রী মুখ।

গঙ্গাচরণ বললে—ক্ষ্যান্ত, তোমার বসন্ত হয়েছিল ?

—হ্যাঁ দাদাঠাকুর। আজ তিন বছর আগে।

—ডাবের জল দিয়ে মুখ ধুলে ও দাগ কটা আর থাকতো না।

—আপনিও যেমন দাদাঠাকুর। আর কি হবে মুখের চেহারা নিয়ে বলুন। সে দিন চলে গিয়েচে, কপাল যেদিন পুড়েচে, হাতের নোয়া ঘুচেছে। এখন আশীর্বাদ করুন, যেন ভালোয় ভালোয় যেতে পারি।

তারপর চুপি চুপি বললে—আপনি ওই পুকুরের বাঁশঝাড়ের ধারে দাঁড়িয়ে থাকুন গিয়ে।

গঙ্গাচরণ সবিস্ময়ে বললে—কেন ?

—চুপ চুপ। বাবাকে লুকিয়ে দুটো চাল দিচ্চি আপনাকে। কাউকে বলবেন না। আধ পালিটাক চাল আমি আলাদা করে রেখে দিইচি আপনার রান্নার চাল আনবার সময়। নিয়ে যান চাল কটা। আপনার মন খারাপ হয়েচে বাড়ীর জন্যি আমি তা বুঝতে পেরেচি।

মেয়েরাই লক্ষ্মী। মেয়েরাই অন্নপূর্ণা। বুভুক্ষু জীবের অন্ন ওরাই দু'হাতে বিলোয়। ক্ষ্যান্তমণিকে আঁচলের মুড়োতে লুকিয়ে চাল আনতে দেখে দূর থেকে গঙ্গাচরণের ওই কথাই মনে হলে। ক্ষ্যান্ত গঙ্গাচরণের পায়ের ধুলো নিয়ে বললে—হাতে করে দুটো চাল দোবো ব্রাহ্মণকে, এ কত ভাগ্যি! কিন্তু বাবাঠাকুর, যে আকাল পড়েচে, তাতে কাউকে কিছু দেবার জো নেই। সবই অদেষ্ট। লুকিয়ে নিয়ে যান—

—লুকিয়েই নিয়ে যাচ্ছি—

—না লুকিয়ে নিয়ে গেলি নোকে চেয়ে নেবে। না দিলি কান্নাকাটি করবে, এমন মুশকিল হয়েচে।…আমাদের গাঁয়ে তো দোর বন্ধ না করে দুপুরে খেতে বসবার জো নেই। সবাই এসে বলবে, ভাত দ্যাও। দেখে দুঃখুও হয়—কিন্তু কতজনকে ভাত দেবেন আপনি ? খ্যামতা যখন নেই, তখন দোর বন্ধ করে থাকাই ভালো। একটা কথা বলি—

—কি ?

—যদি কখনো এমন হয়, না খেয়ে থাকতি হয়, তবে আমার কাছে আসবেন, আমি যা পারি দেবো। আমার নিজের সোয়ামী-পুত্তুর নেই, দেবতা ব্রাহ্মণের সেবাও যদি না করলাম, তবে জীবনে করলাম কি বলুন!

বাড়ী ফিরবার পথে নসরাপুরের বিলের ধারে একটা দোকান। বেলা পড়ে এসেছে। দোকানীকে তামাক খেতে দেখে গঙ্গাচরণ দোকানে গিয়ে উঠে বললে—তামাক খাওয়াও দিকি একবার—

দোকানী বললে—আপনারা ?

—ব্রাহ্মণ!

—পেরণাম হই।

—জয়স্তু।

দোকানী উঠে গিয়ে একটা কলার পাতা নিয়ে এসে ঠোঙা করে কল্কে বসিয়ে গঙ্গাচরণের হাতে দিলে—বললে—আপনার নিবাস ?

—নতুন পাড়া, চর পোলতা।

—গিয়েছিলেন কোথায় ?

—নিবারণের বাড়ী, ও গাঁয়ের নিবারণ ঘোষ।

—বাবাঠাকুরের পুঁটুলিতে কি ? চাল ?

—হ্যাঁ বাপু।

—ঢেকে রাখুন। এসব দিকে বড্ড আকাল। এখুনি এসে ঘ্যান ঘ্যান করবে সবাই।

গঙ্গাচরণ বসে থাকতে থাকতে তিন-চারটি দুলে বাগদি জাতীয় স্ত্রীলোক এসে আঁচলে

বেঁধে কলাই নিয়ে গেল। একজন নিয়ে গেল অপকৃষ্ট পাতা চা ও একটা ছোট্ট পাথরবাটিতে একবাটি গুড়। দোকানী বললে—বসুন ঠাকুরমশায়—

—না বাপু, আমি যাবো অনেক দূর, উঠি।

—না, একটু চা খেয়ে যেতেই হবে। আর তো কিছু দেওয়ার নেই, বসুন—

—চা খাবো আবার—

—হ্যাঁ, একটুখানি খেয়ে যান দয়া করে।

—আরও পাঁচ-ছটি খদ্দের দোকানে এল গেল। সকলেই নিয়ে গেল কলাই। শুধু কলাই, আর কিছু নয়।

চা একটু পরে তৈরি হয়ে এল, একটা কাঁচের গ্লাসে করে দোকানী ওকে চা দিলে। গঙ্গাচরণ লক্ষ্য করলে দোকানের মধ্যে তাকে, মেজের ওপর, নানা জায়গায় পেতল কাঁসার বাসন থরে থরে সাজানো। বেশির ভাগ থালা আর বড় বড় জাম বাটি। গঙ্গাচরণ ব্যাপারটা বুঝতে পারলে না, এরা কি কাঁসারি? বাসন কেন এত বিক্রির জন্যে?

দোকানী আবার তামাক সাজলে। গঙ্গাচরণের মনের কথা বুঝতে পেরে বললে—ও বাসন অত দেখচেন, ওসব বাঁধা দিয়ে গিয়েচে লোকে। এ গাঁয়ে বেশির ভাগ দুলে বাগদি আর মালো জাতের বাস। নগদ পয়সা দিতি পারে না, ওই সব বাসন বাঁধা দিয়ে তার বদলে কলাই নিয়ে যায়।

—সবাই কলাই খায়?

—তা ছাড়া কি মিলবে ঠাকুরমশায়। ওই খাচ্চে—

—তোমার চাল নেই?

—না ঠাকুরমশায়।

—আমি দাম দেবো, সত্যি কথা বলো। নগদ দাম দেবো।

—না ঠাকুরমশায়। হাত জোড় করে বলচি ও অনুরোধ করবেন না!

—তোমরা কি খাও বাড়ীতে?

—মিথ্যে কথা বলবো না, ভাত চার আনা, কলাই বারো আনা। ডাঁটা শাক দুটো করেলাম বাড়ীতে, তা সে রাখবার উপায় নেই। দিনমানেই ক্ষেতে লোকজন, মেয়েছেলে, খোকা-খুকীরা ঢুকে গোছা গোছা উপড়ে নিয়ে যাচ্চে। সাবাড় করে দিয়েচে সব। কিছু রেখে খাবার জো নেই। চালকুমড়ো ফলেছিল গোটাকতক এই দোকানের চালে, কে তুলে নিয়ে গিয়েচে।

গঙ্গাচরণ তামাক খাওয়া সেরে ওঠাবার যোগাড় করলে। দোকানী বললে—ঠাকুরমশায় কলাই নেবেন?

—দাও।

—নিয়ে যান সেরখানেক। এর দাম আপনাকে দিতে হবে না। আর একটা জিনিস—দাঁড়ান, গোটাকতক পেয়ারা দিই নিয়ে যান, আমার গাছের ভালো পেয়ারা—তাও আর কিছু নেই, সব পেড়ে নিয়ে গেল ওরা। আমি ডাঁসা দেখে দশ-বারোটা জোর করে কেড়ে নিয়ে রেখেছিলাম।

গঙ্গাচরণ বাড়ী পেঁছে দেখলে অনঙ্গ-বৌ চুপ করে শুয়ে আছে। এমন সময়ে সে কখনো শুয়ে থাকে না।

গঙ্গাচরণ জিজ্ঞেস করলে—শুয়ে কেন ? শরীর ভালো তো ? দেখি—

অনঙ্গ-বৌ যন্ত্রণাকাতর হয়ে বললে—কাউকে ডাকো।

—কাকে ডাকবো ?

—কাপালীদের বড়-বৌকে ডাকো চট করে। শরীর বড্ড খারাপ।

গঙ্গাচরণ বড় ছেলেকে বললে—দৌড়ে যা কাপালী-বাড়ী—বলগে এক্ষুণি আসতে হবে। আর শরীর খারাপ—

অনঙ্গ-বৌ যন্ত্রণায় চীৎকার করতে লাগলো, কখনো ওঠে কখনো বসে। যূপবন্ধ আর্ত পশুর মত চীৎকার। গঙ্গাচরণ নিরুপায় অবস্থায় বাইরের দাওয়ায় বসে তামাক টানতে লাগলো। তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েচে, আকাশে পঞ্চমী তিথির এক ফালি চাঁদও উঠেচে। ঝিঁঝিঁ ডাকচে লেবু-ঝোপে। গঙ্গাচরণ আর সহ্য করতে পারচে না অনঙ্গ-বৌয়ের চীৎকার। ওর চোখে প্রায় জল এল। ততক্ষণে বাড়ীর মধ্যে আশেপাশের বাড়ীর মেয়েছেলে এসে গিয়েচে।

ওদের মধ্যে একজন বর্ষীয়সীকে ডেকে গঙ্গাচরণ উদ্‌ভ্রান্ত সুরে জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ দিদিমা, বলি ও অমন করছে কেন ?

ঠিক সেই সময় একটা যেন মৃদু গোলমাল উঠলো। একটি শিশুকণ্ঠের ট্যাঁ ট্যাঁ কান্না শোনা গেল। বার-কয়েক শাঁক বেজে উঠলো।

সতীশ কাপালীর মেয়ে বিন্দি বাড়ীর ভেতর থেকে ছুটে এসে বললে—ও দাদাবাবু, বৌদিদির খোকা হয়েচে—এখন সন্দেশ বের করুন আমাদের জন্যে—দিন টাকা—

গঙ্গাচরণের চোখ বেয়ে এবার সত্যিই ঝর ঝর করে জল পড়লো।

তার পর দিনকতক সে কি কষ্ট ! প্রসূতিকে খাওয়ানোর কি কষ্ট। না একটু চিনি, না আটা, না মিছরি। অনঙ্গ-বৌ শুয়ে থাকে, নবজাত শিশু ট্যাঁ-ট্যাঁ করে কাঁদে, গঙ্গাচরণ কাপালীদের বড়-বৌকে বলে—ওর খিদে পেয়েছে, মুখে একটু মধু দ্যাও খুড়ী—

—মধু খেয়ে বমি করেছে দুবার। মধু পেটে রাখছে না।

—তবে কি দেবে খুড়ী, দুধ একটু জ্বাল দিয়ে দেবো ?

—অত ছোট ছেলে কি গাইয়ের দুধ খেতে পারে ? আর ইদিকি আঁতুড়ে-পোয়াতি ঘরে, তার খাবার কোনো যোগাড় নেই। হিম হয়ে বসে থাকলে চলবে না বাবাঠাকুর, এর যোগাড় কর।

গ্রামে কোন কিছু মেলে না, হাটেবাজারেও না। আটা সুজি বা চিনি আনতে হোলে যেতে হবে মহকুমা শহরে সাপ্লাই অফিসারের কাছে। গঙ্গাচরণ দু-একজনের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করলে, মহাকুমা শহরেই যেতে হবে।

সাড়ে সাত ক্রোশ পথ।

সকালে রওনা হয়ে বেলা এগারোটার সময় সেখানে পেঁছিলো। এখানে দোকানে অনেক রকম জিনিস পাওয়া যাচ্ছে। গঙ্গাচরণের হাতে পয়সা নেই, জলখাবারের জন্য মাত্র দু'আনা রেখেছিল, কিন্তু খাবে কি, চিঁড়ে পাঁচসিকে সের, মুড়িও তাই। মুড়কি চোখে দেখবার জো নেই। দু'আনার মুড়ি একটা ছোট্ট বাটিতে ধরে।

ক্ষেত্র কাপালী বললে—ও দাদাঠাকুর, এ যে ভয়ানক কাণ্ড দেখছি। খাবা কি ?

গঙ্গাচরণ ও ক্ষেত্র কাপালী সাপ্লাই অফিসারের অফিসে এসে দেখলে সেখানে রথযাত্রার ভিড়। আপিসঘরের জানলা দিয়ে পারমিট বিলি করা হচ্চে, লোকে জানলার কাছে ভিড় করে দাঁড়িয়ে পারমিট নিচ্চে। সে ভিড়ের মধ্যে ছত্রিশ জাতির মহাসম্মেলন। দস্তুরমত বলবান ব্যক্তি ছাড়া সে ব্যূহ ভেদ করে ভেতরে প্রবেশ অসম্ভব। ঘরের মধ্যে থেকে মাঝে মাঝে তাড়া শোনা যাচ্চে, লোকজন কিছু কিছু পিছিয়ে আসচে, কিছুক্ষণ পরেই আবার পূর্বের অবস্থা, ভিড়ের স্থিতিস্থাপকত্ব দিব্যি বেশি।

গঙ্গাচরণ হতাশভাবে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলে। ভিড় কমবার নাম নেই,—বরং ক্রমবর্ধমান। গরমও তেমনি, আকাশে মেঘ জমে গুমটের সৃষ্টি করেচে। এক ঘণ্টা কেটে গেল—হঠাৎ ঝুপ করে জানলা বন্ধ হয়ে গেল। শোনা গেল হাকিম আহার করতে গেলেন, আবার কখন আসবেন তার কিছু ঠিক নেই। ভিড় ক্রমে পাতলা হয়ে এল—লোকজন কতক গিয়ে আপিসের সামনে নিমগাছের তলায় বসে বিড়ি টানতে লাগলো।

ক্ষেত্র কাপালী বললে—ঠাকুরমশাই, কি করবেন ?

—বসি এসো।

—চলুন, বাজারে গিয়ে খোঁজ করি। যদি দোকানে পাই। এ ভিড়ে ঢুকতি পারবেন না।

বাজারে গিয়ে প্রতি দোকানে খোঁজ করা হোল। জিনিস নেই কোনো দোকানে। পাতিরাম কুণ্ডুর বড় দোকানে গোপনে বললে—সুজি দিতে পারি, দেড় টাকা সের। লুকিয়ে নিয়ে যাবেন সন্দের পর।

ক্ষেত্র কাপালী বললে—আটা আছে ?

—আছে, বারো আনা করে সের।

—মিছরি ?

—দেড় টাকা সের। সন্দের পর বিক্রি হবে।

গঙ্গাচরণ হিসেব করে দেখলে, কাছে যা টাকা আছে তাতে বিশেষ কিছু কেনা হবে না। পারমিট পেলে সস্তায় কিছু বেশি জিনিস পাওয়া যেতে পারে। আবার ওরা দুজনে সাপ্লাই অফিসারের আপিসে এল, তখন ভিড় আরও বেড়েচে, কিন্তু জানলা খোলে নি।

একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বসে আছেন। গঙ্গাচরণ বিড়ি খাওয়ার জন্য তার কাছে গেল। জিজ্ঞেস করলে—আপনার নিবাস কোথায় ?

—মালিপোতা।

—সে তো অনেক দূরে। কি করে এলেন ?

—হেঁটে এলাম, আবার কিসে আসবো ? গরীব লোক, এ বাজারে নৌকো কি গাড়ীভাড়া করে আসবার খ্যামতা আছে ?

—কি নেবেন ?

—কিছু খাবার নেই ঘরে। আমার বিধবা পিসী ঘরে, তাঁর একাদশী আসচে। দশমীর দিন রাত্তিরে দুখানা রুটি করেও তো খাবেন। তাই আটা নিতে এসেচি।

—চাল পাচ্ছেন ওদিকে ?

—পাবো না কেন, পাওয়া যায়। দু'টাকা কাঠা—তাও অনেক খুঁজে তবে নিতি হবে। থাওয়া হয় না মাঝে মাঝে।

এই সময় জানলা খোলার শব্দ হতেই লোকের ভিড় সেই দিকেই ছুটলো। গঙ্গাচরণ বৃদ্ধের হাত ধরে বললে—শীগ্গির আসুন, এর পর আর জায়গা পাব না—

তাও এরা পিছিয়ে পড়ে গেল। অতগুলো মরীয়া লোকের সঙ্গে দৌড়পাল্লায় প্রতিযোগিতা করা এদের পক্ষে সম্ভব হোল না। এদের পক্ষে বেশির ভাগ এসেচে আটা যোগাড় করতে।

একজনকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল সে দুপুরবেলা চাল যোগাড় না করতে পেরে উপবাসে আছে, একটু আটা নিয়ে গেলে তবে তার দিনের আহার পেটে পড়বে। তারা মরীয়া হবে না তো মরীয়া হবে কে?

আরও এক ঘণ্টা কেটে গেল। তারপর গঙ্গাচরণ জানলার সামনে দাঁড়াবার জায়গা পেলে।

সাপ্লাই অফিসার টানা টানা কড়া সুরে জিজ্ঞেস করলেন—কি?

গঙ্গাচরণের ভরসা ছিল তার চেহারার দিকে চাইলে সাপ্লাই অফিসার ভদ্রলোক বা ব্রাহ্মণ বলে খাতির করবে। কিন্তু তাতে নিরাশ হতে হোল, কারণ হাকিম চোখ তুলে তার দিকে চাইলেন না। তাঁর চোখ টেবিলের ওপরকার কাগজের দিকে। হাতে কলের কলম, অর্থাৎ যে কলম কালিতে ডোবানোর দরকার হয় না।

গঙ্গাচরণের গলা কেঁপে গেল, বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করতে লাগলো। হাত-পা কাঁপতে লাগলো।

সে বললে—হুজুর, আমার স্ত্রী আঁতুড়ে। কিছু খাবার নেই, আঁতুড়ের পোয়াতি, কি খায়, না আছে একটু আটা—

হাকিম ধমকের সুরে বললেন—আঃ কি চাই?

—আটা, চিনি, সুজি, একটু মিছরি—

—ওসব হবে না।

—না দিলে মরে যাবো হুজুর। একটু দয়া করে—

—হবে না। আধসের আটা হবে, একপোয়া সুজি, একপোয়া মিছরি—

বলেই খস্ খস্ করে কাগজে লিখে হাকিম গঙ্গাচরণের হাতে তুলে দিয়ে বললেন—যাও—

—হুজুর, পাঁচ-ছ'কোশ দূরে থেকে আসচি। এতে ক'দিন হবে হুজুর। দয়া করে কিছু বেশি করে দিন—

—আমি কি করবো? হবে না যাও—

গঙ্গাচরণ হাত জোড় করে বললে—গরীব ব্রাহ্মণ, দয়া করে আমায়—

হাকিম বিরক্তির সঙ্গে হাত বাড়িয়ে বললেন—দেখি কাগজ? যাও, এক সের আটা—যত রক্ত—

লোকজনের ধাক্কায় গঙ্গাচরণকে ছিটকে পড়তে হোল জানলা থেকে। পেছন থেকে একজন বলে উঠলো—ওমা, দেরি করো কেন? কেমনধারা লোক তুমি? সরো—

চাপরাসী চেঁচিয়ে বললে—হঠ্ যাও—

বাজারে দোকান থেকে আটা কিনতে গিয়ে দেখলে আটা এবং সুজি দুই-ই খারাপ একেবারে খাদ্যের অনুপযুক্ত নয় বটে তবে জিনিস ভালও নয়।

একটা ময়রার দোকানে ওরা খাবার খেতে গেল। ক্ষেত্র কাপালীর বড় ইচ্ছে সে গরম সিঙাড়া খায়। শহর বাজারে তো প্রায় আসা হয় না—থাকে নিতান্ত অজ পাড়াগাঁয়ে কিন্তু খাবারের দোকানে সিঙাড়া কিনতে গিয়ে সে দেখলে পানের খিলি অপেক্ষা একটু বড় সিঙাড়া একখানার দাম দু পয়সা। জিনিসপত্রের আগুন দর। সন্দেশের সের এ অঞ্চলে চিরকাল ছিল দশ আনা, বারো আনা, এখন তাই হয়েচে তিন টাকা। রসগোল্লা দু' টাকা

ক্ষেত্র কাপালী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—কোনো জিনিস কিনবার জো নেই ঠাকুরমশাই!

—তাই তো দেখচি—

—কি খাবো বলুন তো। এ তো দেখচি এক টাকার কম খেলি পেট ভরবে না। আপনি খাবা না?

—না, আমি কি খাবো। আমার খিদে নেই।

—সে হবে না ঠাকুরমশাই। আমার কাছে যা পয়সা আছে, দুজনে ভাগ করে খাই।

গঙ্গাচরণ ধমক দিয়ে বললে—কেন মিছে মিছে বাজে কথা বলিস? খেয়ে নিগে যা—

কিন্তু গঙ্গাচরণের বড় লোভ হোল একখানা থালায় সাজানো বড় বড় জোড়া সন্দেশ দেখে। তার নিজের জন্যে নয়, অনঙ্গ-বৌ কতকাল কোন জিনিস খায় নি। ওর জন্যে যদি দুখানাও নিয়ে যাওয়া যেতো।

ক্ষেত্র কাপালী গরম সিঙাড়া খেয়ে জল খেয়ে পানের দোকানে পান কিনতে গিয়েচে—ও তখন ময়রাকে বললে—তোমার ঐ জোড়া সন্দেশের দাম কত?

—চার আনা করে।

—দুখানা চার আনা?

—সেকাল নেই ঠাকুর। একখানার দাম চার আনা।

গঙ্গাচরণ অবাক হোল। ওই জোড়া সন্দেশের একখানির দাম ছিল এক আনা। সেই জায়গায় একেবারে চার আনা! সে কি কেনা ওর চলবে? অসম্ভব। হাতে অত পয়সা নেই। গঙ্গাচরণ বার বার জোড়া সন্দেশের দিকে চাইতে লাগলো। সুন্দর সন্দেশ গড়েচে। কারিগর ভালো।

ঠোঙা থেকে বের করেই যদি অনঙ্গর হাতে দেওয়া যেতো!

—ওগো, দ্যাখো কি এনেচি—

—কি গা?

—কেমন জোড়া সন্দেশ, দেখেচ? তোমার জন্যে নিয়ে এলাম।

কখনো স্ত্রীর হাতে কোনো ভাল খাবার তুলে দেয় নি। পাবেই বা কোথায়? কবে সচ্ছল পয়সার মুখ দেখেচে সে? তার ওপর এই ভীষণ মন্বন্তর।

ক্ষেত্র কাপালীর কাছেও পয়সা নেই যে ধার করবে। সে পেটুক ব্যক্তি। বসে বসে, যা কিছু এনেছিল, জিলিপি আর সিঙাড়া কিনেই ব্যয় করেচে।

বেলা পড়ে এসেচে। নদীর ধার দিয়ে দিয়ে রাস্তা। দুজনে পথ হেঁটে চললো গ্রামের দিকে। ক্ষেত্র কাপালী বিড়ি টানচে আর বকবক করে বকচে। গঙ্গাচরণ চাদরের প্রান্তে দুটি মুড়ি-মুড়কি বেঁধে নিয়েচে—মাত্র দু'আনার। এত অল্প জিনিস যে কয়েক মুঠো খেলেই

য়ে যাবে। ছেলে দুটো বাড়ীতে আছে, বলবে এখন, বাবা কি এনেচ আমাদের জন্যে ? নমানুষ, তারা কি মন্বন্তর বোঝে ? তাদের জন্যে দুটো নিয়ে যেতে হবে, দুটো ও খাবে া ভাল পরিষ্কার জায়গায় বসে। খেয়ে নদীর জল পান করবে। সারাদিন অনাহার, া ও তৃষ্ণা দুই প্রবল !

এক জায়গায় গাছতলায় বসে গঙ্গাচরণ দু'তিন মুঠো মুড়ি-মুড়কি খেয়ে নিয়ে জলে নামতে দেখলে একটা শেওলা দামের ওপারে অনেক কলমীশাক। আজকাল দুর্লভ, শাক- া কি লোক রাখচে ? ক্ষেত্র কাপালীকে বললে—জলে নামতে পারবি ? শাক নিয়ে তো দিকি—

ক্ষেত্র কাপালী গামছা পরে জলে নেমে একগলা জল থেকে দাম টেনে এনে কলমীলতার ডাঙার কাছে তুললে। তারপর দুজনে মিলে শাক ছিঁড়ে বড় দু'আটি বাঁধলে।

বাড়ী ফিরতেই অনঙ্গ-বৌ ক্ষীণস্বরে বললে—ওগো, এলে ? এদিকে এসো—

—কেমন আছ ?

—এখানে বোসো। কোথায় গিইছিলে এতক্ষণ ? কতক্ষণ যেন দেখি নি—

—টাউনে গেলাম তো। তোমাকে বলেই তো গেলাম। জিনিস-পত্র নিয়ে এলাম সব।

অনঙ্গ নিস্পৃহ, উদাস সুরে বললে—বোসো এখানে। সারাদিন টো টো করে বেড়াও য় ? তোমায় একটুও দেখতে পাই নে।

গঙ্গাচরণের মনে বড় কষ্ট হোল ওকে দেখে। বড় দুর্বল হয়ে পড়েচে অনঙ্গ-বৌ। এমন র কথাবার্তা ও বড় একটা বলে না। এ হোল দুর্বল রোগীর কথাবার্তা। অনাহারে , দুর্বল হয়ে পড়েচে, কতকাল ধরে পেট পুরে খেতে পেতো না, কাউকে কিছু মুখ ফুটে ওর স্বভাব নয়, কত সময় নিজের বাড়া ভাত অপরকে খেতে দিয়েচে। শরীর সে সবের শোধ নিচ্চে এখন।

গঙ্গাচরণ সস্নেহে বললে—তুমি ভাল হয়ে ওঠো। তোমাকে জোড়া সন্দেশ এনে খাওয়াবো থেকে। হরি ময়রা যা সন্দেশ করেচে ! দেখলে খেতে ইচ্ছে করে।

অনঙ্গ-বৌ আঁতুড় থেকে বেরিয়েচে, কিন্তু বড় দুর্বল, শীর্ণদেহ। খেতেই পায় না তা কোথা থেকে। গঙ্গাচরণ প্রাণপণে চেষ্টা করে খাবারের এটা সেটা যোগাড় করতে, পেরে ওঠে না। একটু ঘি কত কষ্টে গঙ্গানন্দপুরের শশী ঘোষের বাড়ী থেকে যোগাড় নিয়ে এল। তাও ঘোষমশায় আট টাকা সেরের কমে ছাড়তে চায় না। ব্রাহ্মণত্বের দিয়ে অনেক করে ঘিটুকু যোগাড় করা।

যদি বা মেলে দূর গ্রামে, নিজ গ্রামে না মেলে একটু দুধ, না একটু মাছ।

নঙ্গ-বৌ বললে—ওগো, তুমি টো টো করে অমন বেড়িও না।। তোমার চেহারাটা হয়ে গিয়েচে। আয়নায় মুখখানা একবার দেখো তো—

গাচরণ বললে—দেখা আমার আছে। তুমি ঠাণ্ডা হও তো।

-চাল পেয়েছিলে ?

অল্প যোগাড় করেছিলাম কাল।

তোমরা খেয়েছ ?

হুঁ।

অনঙ্গ-বৌ আঁতুড় থেকে বেরুলেও নড়তেচড়তে পারে না—শুয়েই থাকে। রান্না ক
গঙ্গাচরণ ও হাবু। পাঠশালা আজকাল সবদিন হয় না। বিশ্বাসমশায় এখান থেকে স
যাওয়াতে পাঠশালার অবস্থা ভাল নয়। এ দুর্দিনে আকস্মিক বিপৎপাতের মত দুর্গা ভট্চ
একদিন এসে হাজির। গঙ্গাচরণ পাঠশালাতে ছেলে পড়াচ্চে।

—এই যে পণ্ডিতমশায়!

গঙ্গাচরণ চমকে গেল। বললে—আসুন, কি ব্যাপার?

—এলাম।

—ও, কি মনে করে?

—মা ভাল আছেন?

—হুঁ।

—সন্তানাদি কিছু হোল?

—হয়েচে।

গঙ্গাচরণ তখনও ভাবচে, দুর্গা ভট্চাযের মতলবখানা কি। ভট্চায কি বাড়ী যে
চাইবে নাকি? কি মুশকিলেই সে পড়েচে। কত বড়লোক আছে দেশে, তাদের বাড়ী
যা না কেন বাপু। আমি নিজে পাইনে খেতে, কোনো রকমে ছেলে দুটোর আর রো
বউটার জন্যে দুটি চাল আটা কত কষ্টে যোগাড় করে আনি, ভগবান তা জানেন। থা
থাকে, এ ভ্যাজাল কোথা থেকে এসে জোটে তার মধ্যে।

দুর্গা একটা ছেলেকে উঠিয়ে তার কেরোসিন কাঠের বাক্সটার ওপর বসলো, তার
গলার উড়ুনিখানা গলা থেকে খুলে হাঁটুর ওপর রেখে বললে—একটু জল খাওয়াতে—

—হ্যাঁ হ্যাঁ। ওরে পটলা, টিউবওয়েল থেকে জল নিয়ে আয় দিকি ঘটিটা মেজে।

—একটা কথা আছে আপনার সঙ্গে, বলচি—জলটা খাই। তেষ্টায় জিব শুকিয়ে গিয়েচে

জল পান করে দুর্গা পণ্ডিত একটু সুস্থ হয়ে বললে—আঃ!

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। তারপর দুর্গাই প্রথম বললে—বললে—বড় বিপদে পড়ে
পণ্ডিত মশাই—

—কি?

—এই মন্বন্তর, তার ওপর চাকরিটা গেল।

—পাঠশালার চাকরি?

—হ্যাঁ মশাই। হয়েচে কি, আমি আজ ন'টি বছর কামদেবপুর পাঠশালার সেকে
পণ্ডিতি করচি, মাইনে আগে ছিল সাড়ে তিন টাকা, এখন দেয় পাঁচ টাকা। তা মশ
গোয়ালা হোল ইস্কুলের সেক্রেটারি। আজ পাঁচ মাস হোল কোথা থেকে এক গোয়ালার ছে
জুটিয়ে এনে তাকে দিয়েচে চাকরি। সে করলে কি মশাই! দার্জিলিং গেল বেড়াতে
সেখান থেকে এসে উন্মাদ পাগল হয়ে গেল—

—কেন কেন?

-তা কি করে জানবো মশাই। কোথাকার নাকি ফটোগেরাপ তুলতে গিয়েছিল, সায়ে
কি খাইয়ে দেয়—এই তো শুনতে পাই। মশাই, তুমি পাও পাঁচ টাকা মাইনে, তোমার দে
দার্জিলিং—দার্জিলিং-এ যাওয়ার কি দরকার? সেখানে সায়েব-সুবোদের জায়গা। বাঙালী
সেখানে গেলে পাগল করে দেয় ওষুধ খাইয়ে। সাধে কি আর বলে-

—সে যাক, আসল কথাটা কি সংক্ষেপে বলুন—

—তারপর সে ছোকরা আজ তিন মাস পরে এসে জুটেচে। এখন আর পাগল নেই, র গিয়েচে। তাকে নেবে বলে আমায় বললে—আপনি এক মাস ছুটির দরখাস্ত করুন—

—আপনি করে দিলেন ?

—দিতে হোল। হেডমাস্টার নিজে আমার টেবিলে এসে বলে—লিখুন দরখাস্ত। লিখলাম। আর করি। তখুনি মঞ্জুর করে দিলে। এখন দেখুন বিপদ! ঘরে নেই চাল, তার র নেই চাকরি। আমি এখন কি করি। বাড়ীসুদ্ধ যে না খেয়ে মরে। তাই ভাবলাম যাই পনার কাছে। একটা পরামর্শ দ্যান। আর তো কেউ নেই যে তাকে দুঃখের কথা বলি।

গঙ্গাচরণ মনে মনে বললে—দুঃখের কথা একবার ছেড়ে একশো বার বলো। কিন্তু বাড়ী ত চাও যদি, তবেই তো আসল মুশকিল। দুর্গা ভট্চাযের মতলবখানা যে কি, তা াচরণ ধরতে না পেরে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল। ছেলে দুটির চাল াটানো যাচ্চে না, বউটার জন্যে কত কেঁদেকেকিয়ে এক সের আটা নিয়ে আসা, এই সময় র্গা ভট্চায যদি গিয়ে ঘাড়ে চাপে, তবে চোখে অন্ধকার দেখতে হবে যে দেখচি। স্ত্রীও ন নির্বোধ, যদি ও গিয়ে হাজির হয় আর কাঁদুনি গায় তার সামনে, তবে আর দেখতে হবে । মুখের ভাত বেড়ে দেবে। নিজে না খেয়ে ঐ বুড়োটাকে খাওয়াবে।

নাঃ, কি বিপদেই সে পড়েচে।

এখন মতলবখানা কি বুড়োর ?

বসে বসে গঙ্গাচরণ আকাশপাতাল ভাবতে লাগলো।

যদি ছুটির পরে দুর্গা ভট্চায তার সঙ্গে তার বাড়ী যেতে চায়, তবে ?

না, ও চলবে না। একটা কিছু ফান্দি বার না করলে চলবে না। এমন কিসের খাতির র্গা ভট্চাযের সঙ্গে যে নিজের স্ত্রী-পুত্রের মুখ বঞ্চিত করে ওকে খেতে দিতে হবে ?

দুর্গা ভট্চায বলে—ছুটি দেবেন কখন ?

—ছুটি ? এখনও অনেক দেরি।

—সকাল বিকেল করেন, না এক বেলাই ?

—এক বেলা।

গঙ্গাচরণ তামাক সেজে খাওয়ালে নিজের হাতে দুর্গাকে।

দুর্গা তামাক খেয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে হুঁকোটি গঙ্গাচরণের হাতে দিয়ে বললে—এখন যে বিপদে পড়ে গেলাম। চাকরি নেই, হাতে একটা পয়সা নেই—আপনার কাছে বলতে , আজ দু'দিন সপরিবারে না খেয়ে খিদের জ্বালায় ছুটে এলাম, বলি কোথায় যাই ? আর া কেউ নেই কোথাও ? মা-ঠাকরুণ দয়া করেন, মা আমার, অন্নপূর্ণো আমার। তাই—

এর অর্থ সুস্পষ্ট। দুর্গা ভট্চায বাড়ীই যাবে। সেইজন্যেই এখনো ওঠে নি, বসে বসে মাক খাচ্চে। দু'দিন খাই নি, সে যখনই আসে, তখনই বলে দু'দিন খাই নি, তিনদিন খাই । কে মশায় তোমাকে রোজ রোজ খাওয়ায়—আর এই দুর্দিনে ? লোকের তো একটা বেচনা থাকা উচিত।

কি মতলব ফাঁদা যায় ? বলা যাবে কি ও বাপের বাড়ী গিয়েচে ? কিংবা ওর বড্ড দুখ ? উঁহু, তাহোলে ও আপদটা সেখানে দেখতে যেতে পারে।

গঙ্গাচরণ আকাশপাতাল ভেবে কিছুই পেল না। ছুটির সময় হয়ে এল। পাঠশালার ছুটি

দিয়ে গঙ্গাচরণ যেমন বাড়ীর দিকে চলবে, ও অমনি চলবে গঙ্গাচরণের সঙ্গে। সোজাস
কথা বললে কেমন হয়? না মশাই, এবার আর সুবিধে হবে না আমার ওখানে। বাড়
অসুখ, তার ওপর চালের টানাটানি।

কিন্তু পরবর্তী সংবাদের জন্যে গঙ্গাচরণ প্রস্তুত ছিল না।

বেলা যত যায় দুর্গা ভট্চায মাঝে মাঝে পাঠশালা থেকে নামে আর রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে সেখহাটি-মণিরামপুরের বিলের দিকে চেয়ে চেয়ে কি যেন দেখে।

দু'তিনবার এ রকম করবার পরে গঙ্গাচরণ কৌতূহলের সুরে বললে—কি দেখচেন?

—এত দেরি হচ্চে কেন, তাই দেখচি।

—কাদের দেরি হচ্চে? কারা?

—ওই যে বললাম। বাড়ীর সবাই আসচে কিনা। আমার স্ত্রী, মেয়েটা, আর ছেলে। সব না খেয়ে আছে যে। আর কোনো উপায় তো দ্যাখলাম না। বলি, চ আমার অন্নপূন্নো মার কাছে। না খেয়ে ষোল-সতেরো বছরের মেয়েটা বড্ড কাতর পড়েচে। দিশেহারা মত হয়ে গিয়েছে মশাই। তা আমি দুটো কলাইসেদ্দ খেলাম মণির পুরের নিধু চক্কত্তির বাড়ী এসে। তাদেরও সেই অবস্থা। গোয়ালার বামুন, এ দুর্দি কোনো কাজকর্ম নেই, পায় কোথায় বলুন। চাল একদানা নেই তাদের ঘরে। নিধু চক্ক বুড়ো মা বুঝি জ্বরে ভুগছে আজ দু মাস। ওই ঘুষঘুষে জ্বর। তারই জন্যে দ পুরনো চাল যোগাড় করা আছে। তিনি খান। ওরা খেতে বসেচে সিদ্ধকলাই। সমান অবস্থা। আমি বলি আমি এগিয়ে গিয়ে বসি পণ্ডিত মশায়ের পাঠশালায়, তো এসো।

সর্বনাশের মাথায় পা!

দুর্গা ভট্চায গুষ্টিসমেত এ দুর্দিনে তারই বাড়ী এসে জুটচে তা হলে! মতলব ক দেখচি ভালোই।

এখন উপায়?

সোজাসুজি বলাই ভালো। না কি?

এমন সময়ে রাস্তা থেকে বালিকা-কণ্ঠে শোনা গেল—ও বাবা—

—কে রে, ময়না? বলেই দুর্গা পণ্ডিত বাইরে চলে গেল।

গঙ্গাচরণ বাইরের দিকে চেয়ে দেখলে, একটি ষোল-সতের বছরের মেয়ে পাঠশা সামনে পথের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটিকে নিয়ে অল্প একটু পরেই দুর্গা পণ্ডিত প শালায় ঢুকে বললে—এই আমার মেয়ে ময়না, ভালো নাম হৈমবতী। প্রণাম করো মা—

কি বিষম মুশকিল!

হৈমবতী এগিয়ে এসে প্রণাম করলে সলজ্জভাবে। বেশ সুন্দরী মেয়ে। ওই রো পটকা, দড়ির মত চেহারা দুর্গা ভট্চাযের এমন সুন্দর মেয়ে!

দুর্গা ভট্চায বললে—ওরা সব কৈ?

হৈমবতী বললে—ওই যে বাবা গাছতলায় বসে আছে মা আর খোকারা। আমি ও কাছে যাই বাবা। বোঁচকা নিয়ে মা হাঁটতে পারচে না।

গঙ্গাচরণের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েচে। এদের তাড়ানো আর তত সহজ নয়। এ বোঁচকা-বুঁচকি নিয়ে আহারের সন্ধানে দেশত্যাগ করে যখন রওনাই হয়েচে। বিশেষ ক

মেয়েটিকে দেখে গঙ্গাচরণের মন নরম হয়েচে। অমন সুন্দরী মেয়ের অদৃষ্টে কি দুঃখ। খেতে পায় নি আজ দুদিন। আহা!

স্নেহে গঙ্গাচরণের মন ভরে উঠলো।

একটু পরে পাঠশালার ছুটি দিয়ে গঙ্গাচরণ সদলবলে বাড়ীর দিকে রওনা হোল।

এরপর দিনকতক কেটে গেল। গঙ্গাচরণের বাড়ীতে দুর্গা ভট্চাযের পরিবারবর্গ পাকাপোক্তভাবে বসেচে। অনঙ্গ-বৌ নিজে খেতে না পেয়ে চিঁ চিঁ করচে অথচ সে কাউকে বাড়ী থেকে তাড়াবে না। ফলে সবাই মিলে উপোস করচে।

এর মধ্যে ময়না বড় ভাল মেয়ে, গঙ্গাচরণ ক্রমে লক্ষ্য করলে। কোন খাবার জিনিস যোগাড় হলে ময়না আগে নিয়ে আসে অনঙ্গ-বৌকে খাওয়াতে। বলে—ও কাকীমা, এটুকু খেয়ে নাও তো!

ময়নার মা আবার বড় কড়া সমালোচক। সে বলে—যা, ও তোর কাকীমাকে দিতে হবে না। ওর শরীর খারাপ, ও তোমার ওই ময়দার গোলা এখন খেতে বসুক। যা, ও নিয়ে যা—

দুর্গা ভট্চায কোথায় সকালে উঠে চলে যায়। অনেক বেলা করে বাড়ী ফেরে। কিছু না কিছু খাবার জিনিস প্রায়ই আনে। চাল আনতে পারে না বটে, কিন্তু আনে হয়তো একটা নারকেল, একটা মানকচু, দুটো বিরি কলাই, নিদেন দুটো বড়ি।

এসব আনে সে ভিক্ষে করে।

আজকাল দুর্গা ভিক্ষে করতে শুরু করেছে।

তবে তার ভিক্ষেটা ঠিক আর পাঁচজন ভিক্ষুকের মত নয়, ওরই মধ্যে একটু কায়দা আছে। সেদিন দুপুরে দুর্গা গিয়ে হাজির এ গ্রামেরই কাপালীপাড়ায়। নিধু কাপালীর বাড়ীর দাওয়ায় উঠে বললে—একটু তামাক খাওয়াতে পার?

নিধু কাপালী ব্রাহ্মণ দেখে শশব্যস্ত হয়ে বললে—আসুন, বসুন, ঠাকুরের কোত্থেকে আসা হচ্ছে?

—আমার বাড়ী কামদেবপুর, আমি আছি এই গঙ্গাচরণবাবুর বাড়ী।

—আপনার কেউ হন? জামাই নাকি?

—না না, আমার সজাতি ব্রাহ্মণ। এমনি এসে আছি ওঁর ওখানে।

—আপনার কি করা হয়?

—কিছুই না। বাড়ীতে জমিজমা আছে। দুটো গোলা ছিল ধানভর্তি, তা শোনলাম ধান রাখতে দেবে না গভর্নমেণ্টের লোক। বিশ মণ ধানের বেশি নাকি রাখতে দেবে না—সব বিক্রি করে ফেললাম।

বলা বাহুল্য এসব কথা সর্বৈব মিথ্যা।

নিধুর কিন্তু খুব শ্রদ্ধা হয়ে যায়, দু'গোলা ধানের মালিক যে ছিল এ বাজারে,সে সাধারণ লোক নয়, হতেই পারে না। আঠার টাকা করে ধানের মণ। দু' গোলায় অন্তত সাত-আট শো মণ ধান ছিল। মোটা টাকা রয়েছে ওর হাতে।

দুর্গা তামাক টানতে টানতে বলে—বাপু হে, ঘরে চিঁড়ে আছে, দুটো দিতে পার? এ গাঁয়ে তোমাদের দেখছি খাদ্যখাদকের বড় অভাব।

—আজ্ঞে, এখানে খাদ্যখাদক মেলেই না—চিঁড়ে ঘরে নেই ঠাকুরমশায়। বড় লজ্জায় ফেললেন—

—না না, লজ্জা কি? তোমাদের এ গ্রামে বাপু এই রকমই কাণ্ড। খাদ্যখাদক কিছু মেলে না। কদিন থেকে ভাবছি দুটো চিঁড়ে ভাজা খাব। তা এ যোগাড় করতেই পারলাম না—অথচ আমার গোলায় এক পৌটি দেড় পৌটি ধান ছিল এই সেদিন।

নিধু কাপালী কাঁচুমাচু হয়ে গেল। এত বড় লোকের সামনে কি লজ্জাতেই সে পড়ে গেল।

দুর্গা বললে—যাক গে। আমসত্ব আছে ঘরে?

—আজ্ঞে না, তাও নেই। ছেলেপিলেরা সব খেয়ে ফেলে দিয়েচে।

—পুরনো তেঁতুল?

—আজ্ঞে না।

—বড় অরুচি হয়ে গেছে মুখে কিনা। তাই দুটো চিঁড়ে ভাজা, পুরনো তেঁতুল একটু এইসব মুখে—বুঝলে না? আরে মশায়, লড়াই বেধেচে বলে মুখ তো মানবে না? এই চালকুমড়ো তোমার?

সামনে গোলার ওপরে চালকুমড়ো লতায় বড় বড় চালকুমড়ো সাদা হয়ে গিয়েচে পেকে। সারি সারি অনেকগুলো আড় হয়ে আছে গোলার চালে। নিধু কাপালী বিনীতভাবে বললে—আজ্ঞে, আমারই।

—দাও একখানা ভাল দেখে। বড়ি দিতে হবে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, এখুনি—

নিধু হাঁ হাঁ করে ছুটে গেল এবং একটা বড় পাকা চালকুমড়ো পেড়ে নিয়ে এল গোলার চাল থেকে। দুর্গা ভট্চায সেটি হাতে ঝুলিয়ে গঙ্গাচরণের বাড়ীর দিকে রওনা হোল হৃষ্ট মনে।

অনঙ্গ-বৌ বললে—ওটা কি হবে জ্যাঠামশাই?

—নিয়ে এলাম মা, আনলেই কাজ দেয়। খাবার জিনিস তো? বড়ি দিও।

—কলাই খেয়ে প্রাণ বেঁচে আছে, বড়ি আর কি দিয়ে দেবো জ্যাঠামশাই?

—আচ্ছা রও, কলাইয়ের ব্যবস্থা করে ফেলচি কাল থেকে।

—না জ্যাঠামশাই, আপনি আমাদের বাড়ী এসেচেন, আর বেরুতে হবে না লোকের বাড়ী চাইতে। যা জোটে তাই খাবো।

—কি জান মা, ব্রাহ্মণের উপজীবিকা হোল ভিক্ষা। এতে লজ্জা নেই কিছু। আমার নেই, আমি ভিক্ষা করবো। লড়াই বেধেচে বলে পেট মানবে?

—না জ্যাঠামশাই, আপনার পায়ে পড়ি ওতে দরকার নেই।

—আচ্ছা, তুমি চুপ করে থাক। সে ব্যবস্থা হবে।

দুর্গা ভট্চায গঙ্গাচরণকে সন্ধ্যাবেলা বললে—একটা পরামর্শ করি। চাষাগাঁয়ে জ্যোতিষীর ব্যবসা বেশ চলে। কাল থেকে বেরুবেন? ওদেরই হাতে আজকাল পয়সা।

—সে গুড়ে বালি। আগে চলত, এখন আর চলবে না। চাল ডাল কেউ দিতে পারবে না। পয়সা হয়ত দেবে কিন্তু চাল দেবে কে? কিনবেন কোথায়?

—ধান যদি দ্যায়?

—কোথাও নেই এদেশে! সে যার আছে, লুকিয়ে রেখেচে, বের করলে পুলিসের হাঙ্গামা। ভয়ে গাপ করে ফেলচে সব। চাষা-গাঁয়ের হালচাল আমাকে শেখাতে হবে না।

—তাহলেও কাল দুজনে বেরুই চলুন। নয়ত না খেয়ে মরতে হবে সপরিবারে।

—যার জমি নেই এ বাজারে, তাকে উপোস করতেই হবে। জমি না চষে পরের খাবে, এ আর চলবে না। চাষা লাঙ্গল ধরে চাষ করে, আমরা তার ওপর বসে খাই, এ ব্যবস্থা ছিল বলেই আজ আমাদের এ দুর্দশা।

গঙ্গাচরণ একটু দম নিয়ে আবার বললে—নাঃ, ও জ্যোতিষ-টোতিষ নয়, এবার যদি নিজের হাতে লাঙ্গল ধরে চাষ করতে হয় তাও করব—একটু জমি পেলে হয়।

দুর্গা হেসে বললে—জমির অভাব নেই এদেশে। নীলকুঠির আমল থেকে বিস্তর জমি পড়ে। আমারই বাড়ীর আশেপাশে দু'বিঘে জমি জঙ্গল হয়ে পড়ে রয়েচে। আমার ভিটে-জমির সামিল সে জমি।

—আপনি করেন না কেন?

—কি করবো তাতে?

—যা হয়, রাঙা আলু করলেও পারতেন। তাই খেয়েও দু'মাস কাটত। আমাদের ভদ্রলোকদের কতকগুলো মস্ত দোষ আছে। পরের পরিশ্রমে আমরা খাব। আপনি আমি এমন কিছু দুশো টাকার চাকরি করিনে, অথচ জমি করব না। এবার টের পাচ্ছি মজা।

দুর্গা ভট্চায ওসব বোঝে না। সকলেই চাষ করবে নাকি? মজার কথা। ও হোল বৈশ্যের কাজ, ব্রাহ্মণে বৈশ্যের কাজ করবে? তা কালে তাও হবে; তিনি শুনেচেন শহরে নাকি কোন বামুনের ছেলে জুতোর দোকান করেচে, জুতোর দোকান, ভেবে দ্যাখ। ব্রাহ্মণের আর কি হতে বাকি রইল?

কাপালীদের বড়-বৌ এসে অনঙ্গ-বৌকে ফিস্ ফিস্ করে বললে—কাল থেকে ছোটবৌকে পাওয়া যাচ্ছে না।

অনঙ্গ-বৌ বললে—সে কি কথা?

—তারে তো জান বামুন-দিদি! ক্যামন স্বভাব ছেল তার। ইটখোলার সেই এক ব্যাটার সঙ্গে—তুমি সতীলক্ষ্মি, সেসব তোমার সঙ্গে বলব না। এখন কাল বিকেল থেকে আর বাড়ীতে দেখ্ছি নে। ঘরের বৌ গেল কোথায়? জাত যে যায় এখন!

—যাক, কারো কাছে বলো না।

—কার কাছে আর বলতে যাচ্ছি দিদি? বলে কাটা কান চুল দে ঢাকো, তবুও তো লোকে জিজ্ঞেস করবে বৌ কোথায় গেল? সদু জেলেনী এখুনি ঢোকবে এখন বাড়ীতে। সে রটাবে এখন সারা গাঁয়ে। কি দায়েই আমি পড়িচি।

দু'দিনের মধ্যে ছোট-বৌয়ের টিকি দেখা গেল না। খোঁজাখুঁজি যথেষ্ট করা হয়েচে। কালীচরণ নিজেও আশেপাশের গ্রামে সন্ধান করেচে।

অনঙ্গ-বৌ রাত্রে বলে—কি হোল?

গঙ্গাচরণ হেসে বললে—কি আর হবে। সে পালিয়েচে সেই যদু-পোড়ার সঙ্গে—সেই ঠিকেদার ব্যাটা, ভয়ানক ধড়িবাজ।

—ওমা সে কি সব্বোনাশ ! হ্যাঁগো কি হবে ওর ? ছুটকির ?

—ওকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দেবে শখ মিটে গেলে। তখন নাম লেখাতে হবে শহরে গিয়ে, নয়ত ভিক্ষে করতে হবে।

চতুর্থ দিন অনেক রাত্রে কে এসে ডাকলে ঘরের বাইরে থেকে—

—ও বামুন-দিদি—

ময়না জেগে উঠে বললে—কে ডাকচে বাইরে, ও দিদি বলে—

সে উঠে দোর খুলে দিতে ছোট-বৌ ঘরে ঢুকল। পরনে নতুন কোরা লালপেড়ে শাড়ী, গায়ে সাদা ব্লাউজ, হাতে নতুন কাঁচের চুড়ি।

অনঙ্গ-বৌ বিস্ময়ের ও আনন্দের সুরে বললে—কি রে ছোট-বৌ ?

ছোট-বৌ মেঝের ওপর বসে পড়ল। একটুখানি চুপ করে থেকে ফিক করে হেসে ফেলল। ময়নার মাও ততক্ষণ উঠেচে। ছোট-বৌয়ের কাণ্ড সব শুনেছে এ ক'দিনে। ময়নার মা ছিল কামদেবপুর গাঁয়ের মধ্যে সকলের চেয়ে নিরীহ মেয়েমানুষ। কখনো কারো কথায় থাকে না, গরীব ঘরের বৌ—দুঃখ-ধান্দার মধ্যে চিরকাল ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলোকে মানুষ করে এসেচে। সে শুধু চুপ করে ওর দিকে চেয়ে রইল। এমন অবস্থায় আবার লোকের মুখে হাসি বেরোয় ? ময়নার মা এই কথাই ভাবছিল।

অনঙ্গ-বৌ রাগের সুরে বললে—হাসি কিসের ?

ছোট-বৌ মুখ চুন করে বললে—এমনি।

—ও পুঁটলি কিসের ?

—ওতে চাল। তোমার জন্যি এনিচি।

—ঝাঁটা মারি তোর চালের মাথায়। নিয়ে যা এখান থেকে। আমি কি করবো তোর চাল ?

—রাগ কোরো না বামুন-দিদি, পায়ে পড়ি। তুমি রাগ কল্লি আমি কনে যাব ?

এবার ছোট-বৌয়ের চোখ দুটো যেন জলে ভরে এল। সত্যিকার চোখের জল।

অনঙ্গ-বৌয়ের মনটা নরম হোল। খানিকটা স্নেহের সুরে বললে—বদমাইশ কোথাকার ! ধাড়ি মেয়ে, তোমার কাণ্ডজ্ঞান নেই, কি কাজ করতে কি কাজ করে বসো তোমার জ্ঞান হয় না ? আজ বাদে কাল কোথায় গিয়ে জবাবদিহি করতে হবে সে খেয়াল হয় না তোমার ? সতের ঝাঁটা মারি তোমার মাথায় তবে যদি এ রাগ যায়।

অজ্ঞান পাপীকে ভগবানও বোধ হয় এমনি সস্নেহে অনুযোগের সুরে তিরস্কার করেন। ছোট-বৌ মুখ চুন করে মাটির দিকে চেয়ে বসে রইল।

এরই মধ্যে একদিন মতি মুচিনী অতি অসহায় অবস্থায় এসে পেঁছিলো ওদের গাঁয়ে।

সকালে হাবু এসে বললে—মতি-দিদিকে দেখে এলাম মা, কাপালীদের বাড়ী বসে আছে। ওর চেহারা বড় খারাপ হয়েছে।

অনঙ্গ-বৌ বললে—কি রকম দেখে এলি ?

—রোগা মত।

—জ্বর হয়েছে ?

—তা কি জানি ! দেখে আসবো ?

হাবু আবার গেল, কিন্তু মতিকে সেখানে না দেখে ফিরে চলে এল।

আর দুদিন ওর কথা কারো মনে নেই, একদিন সকালে মতি হাবুদের বাড়ীর সামনে একটা আমগাছের তলায় এসে শুয়ে পড়লো। ওর হাত-পা ফুলেছে, মুখ ফুলেছে, হাতে একটা মাটির ভাঁড়। সারা দুপুর সেখানে শুয়ে জ্বরে ভুগেছে, কেউ দেখে নি, বিকেলের দিকে গঙ্গাচরণ বাড়ী ফিরবার পথে ওকে দেখে কাছে গিয়ে বললে, কে?

ওকে চিনবার উপায় ছিল না।

মতি অতি কষ্টে গোঙিয়ে গোঙিয়ে বললে—আমি দাদাঠাকুর—

—কে, মতি? এখানে কেন? কি হয়েছে তোর?

—বড্ড জ্বর দাদাঠাকুর, তিন দিন খাই নি, দুটো ভাত খাবো।

—তা হয়েচে ভালো। তুই উঠে আয় দিকি, পারবি?

উঠবার সামর্থ্য মতির নেই। গঙ্গাচরণ ওকে ছোঁবে না। সুতরাং মতি সেখানেই শুয়ে রইল। অনঙ্গ-বৌ শুনতে পেয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলো কিন্তু সেও অত্যন্ত দুর্বল। উঠে মতির কাছে যাওয়ার শক্তি তারও নেই।

বললে—ওগো মতিকে কিছু খেতে দিয়ে এসো—

—কি দেবো?

—দুটো কলাইলের ডাল আছে ভিজনো। এক মুঠো দিয়ে এসো।

—ও খেয়ে কি মরবে? তার জ্বর আজ কতদিন তা কে জানে। মুখ হাত ফুলে ঢোল হয়েচে! কেন ও খাইয়ে নিমিত্তের ভাগী হবো!

—তবে কি দেবো খেতে? কি আছে বাড়ীতে?

খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লো অনঙ্গ। কিন্তু অন্য কিছুই ঘরে নেই। কি খেতে দেওয়া যায়, এক টুকরো কচু ঘরে আছে বটে কিন্তু তা রোগীর খাদ্য নয়। হাবু পুব পাড়ার জঙ্গলের মধ্যে থেকে ওই কচুটুকু আজ দু'দিন আগে তুলে এনেছিল, দুদিন ধরেই এক এক টুকরো সিদ্ধ খেতে খেতে ওই এক ফালি অবশিষ্ট আছে।

ভেবেচিন্তে অনঙ্গ-বৌ বললে—হ্যাঁগা, কচু বেটে জল দিয়ে সিদ্ধ করে দিলে রুগী খেতে পারে না?

—তা বোধ হয় পারে, মানকচু?

—জঙ্গুলে মানকচু।

—তা দাও।

সেই অতি তুচ্ছ খাদ্য ও পথ্য একটা কলার পাতায় মুড়ে হাবু মতির সামনে নিয়ে গেল। অনঙ্গ-বৌ অতি যত্ন নিয়ে জিনিসটা তৈরী করে দিয়েছে। হাবুকে বলে দিয়েছে ওকে এখানে নিয়ে আসবি, বাইরের পৈঁঠেতে বিচুলি পেতে পুরু করে বিছানা করে দিলেই হবে। আমতলায় শুয়ে থাকলে কি বাঁচে?

হাবু গিয়ে ডাকলে,—ও মতি-দিদি, এটুকু নাও—

মতি ক্ষীণ সুরে বললে—কি?

—মা খাবার পাঠিয়েচে—

—কে?

—আমার মা? আমার নাম হাবু, চিনতে পারচো না?

মতি কথা বলে না—খানিকক্ষণ কেটে গেল।

হাবু আবার বললে—ও মতি-দিদি ?

—কি ?

—খাবার নাও। মা দিয়েচে পাঠিয়ে।

—শালিক পাখী শালিক পাখী, ধানের জাওলায় বাস—

—ও মতি-দিদি ? ওসব কি বলচো ?

—কে তুমি ?

—আমি হাবু। ভাতছালায় আমাদের বাড়ী ছিল, মনে পড়ে ?

—বিলের ধারের পদ্মফুল,

নাকের আগায় মোতির দুল,

—ও রকম বোলো না। খেয়ে নাও, গায়ে বল পাবে।

—কি ?

—এই খাবার খেয়ে নাও—

—কে তুমি ?

—আমি হাবু, আমার বাবার নাম গঙ্গাচরণ চক্রবর্তী, পণ্ডিত মশাই ছিলেন, মনে পড়ে না ?

—হুঁ।

—তবে এই নাও খাবার। মা পাঠিয়েচে।

—ওখানে রেখে যাও—

—কুকুরে খেয়ে ফেলবে। তুমি খেয়ে নাও, নিয়ে আমাদের বাড়ী চলো, মা যেতে বলেচে।

—কে তুমি ?

—আমি হাবু। আমার বাবার নাম—

মতি আর কথা বললে না। যেন ঘুমিয়ে পড়লো। হাবু ছেলেমানুষ, আরও দু'তিনবার ডাকাডাকি করে কোনো উত্তর না পেয়ে সে কচু বাটাটুকু ওর শিয়রের কাছে রেখে চলে এলো।

অনঙ্গ-বৌ বললে—কিরে, মতি কই ? নিয়ে এলি নে ?

—সে ঘুমুচ্চে মা। কি সব কথা বলে, আবোল-তাবোল, আমার তো ভয়ই হয়ে গেল। খাবার রেখে এসেচি তার শিয়রে।

—আর একবার গিয়ে দেখে আসবি একটু পরে।

—বাবাকে একটু যেতে বোলো, বাবা ফিরলে।

—তুই আর একটু পরে গিয়ে খাবারটুকু খাইয়ে আসবি—

আরও কিছুক্ষণ পরে হাবু গিয়ে দেখে এল মতি সেইভাবেই মুখ গুঁজে পড়ে আছে। উঠলোও না বা ওর সঙ্গে কোনো কথাও বললে না। কচুবাটা সেইভাবে ওর শিয়রের কাছেই পড়ে। হাবু অনেক ডাকাডাকি করলে, ও মতি-দিদি, ও মতি-দিদি—সন্ধ্যা হয়ে এল। অন্ধকার ঘনিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে আকাশে মেঘ দেখা দিলে, বোধ হয় জল হবে। হাবু খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লো, বিষ্টিতে ভিজবে এখানে বসে থাকলে। মতি-দিদিও এখানে শুয়ে থাকলে ভিজে মরবে। এখন কি করা যায় ?

মাকে এসে ও সব কথা বললে।

অনঙ্গ-বৌ বললে, ময়নাকে নিয়ে যা, দুজনে ধরাধরি করে নিয়ে এসে বাইরের পৈঁঠেতে শুইয়ে রেখে দে—

ময়না হাসিখুশি-প্রিয় চঞ্চলা মেয়ে।

সে বললে—আমরা আনতে পারবো? কি জাত কাকীমা?

—মুচি।

ময়না নাক সিঁটকে বললে—ও মুচিকে ছুঁতে গেলাম বই কি এই ভরসন্দে বেলা? আমি পারবো না, আমি না বামুনের মেয়ে? বলেই হাসতে হাসতে হাবুর সঙ্গে বেরিয়ে চলে গেল।

দুজনে গিয়ে দেখলে মতি সেইভাবেই শুয়ে আছে, সেই একই দিকে ফিরে। ওর মাথার শিয়রে সেই কচুবাটা, পাশে একটা মাটির ভাঁড়।

ময়না গিয়ে ডাকলে, ও মতি—

কোনো সাড়া-শব্দ নেই।

ময়না হাবুর চেয়ে বয়সে বড়, বুদ্ধিসুদ্ধি তার আরও একটু পেকেচে, সে আরও কাছে এগিয়ে গিয়ে ভাল করে দেখে বললে, কাকাবাবু বাড়ী থাকেন তো ডেকে নিয়ে আয় দিকি!

হাবু বললে—কেন?

—আমার যেন কেমন কেমন মনে হচ্ছে হাবু, একজন কোনো বড় লোককে ডেকে নিয়ে আয় দিকি!

এমন সময়ে দেখা গেল কাপালীদের ছোট-বৌ সে পথে আসচে। ময়না বললে—ও মাসি, শোনো ইদিকে—

—কি?

—এসে দেখে যাও, মতি-দিদি কথাবার্তা বলচে না, এমন করে শুয়ে আচে কেন?

ছোট-বৌ তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে ভাল করে দেখলে।

মতি মারা গিয়েচে। সে আর উঠে কচুবাটা খাবে না, ভাঁড়েও আর খাবে না জল। তার জীবনের যা কিছু সঞ্চয়, তা পথের ধারেই ফেলে রেখে সে পরপারে চলে গিয়েচে।

ছোট-বৌ আর ময়নার মুখে সব শুনে অনঙ্গ-বৌ হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলো।

গ্রামে থাকা খুব মুশকিল হয়ে পড়লো মতি মুচিনীর মৃত্যু হওয়ার পরে। অনাহারে মৃত্যু এই প্রথম, এর আগে কেউ জানত না বা বিশ্বাসও করে নি যে অনাহারে আবার মানুষ মরতে পারে। এত ফল থাকতে গাছে গাছে, নদীর জলে এত মাছ থাকতে, বিশেষ করে এত লোক যেখানে বাস করে গ্রামে ও পাশের গ্রামে, তখন মানুষ কখনো না খেয়ে মরে? কেউ না কেউ খেতে দেবেই। না খেয়ে সত্যিই কেউ মরবে না।

কিন্তু মতি মুচিনীর ব্যাপারে সকলেই বুঝলে, না খেয়ে মানুষে তাহলে তো মরতে পারে। এতদিন যা গল্প-কাহিনীতে শোনা যেতো, আজ তা সম্ভবের গণ্ডির মধ্যে এসে পৌঁছে গেল। কই, এই যে একটা লোক মারা গেল না খেয়ে, কেউ তো তাকে খেতে দিলে না? কেউ তো তাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারলে না? সকলের মনে বিষম একটা আশঙ্কার সৃষ্টি হোল। সবাই তো তাহোলে না খেয়ে মরতে পারে!

দুর্গা ভট্‌চায সেদিন দাওয়ায় বসে মতি মুচিনীর মৃত্যুদৃশ্য দেখলে। মনে মনে ভাবলে এবার আমার এতগুলো ছেলেমেয়েকে খেতে দেবে কে? এদের ঘরে তো খাবার নেই, কোনোদিন এক খুঁচি কলাইয়ের ডাল, কোনোদিন বা একটা কুমড়ো, তাই সবাই মিলে ভাগ করে খাওয়া। দুর্গা ভট্‌চায বুড়ো মানুষ, ওর তাতে পেট ভরে না। পেটে খিদে লেগেই আছে, খিদে কোনদিন ভাঙে না। দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়চে। এমন ভাবে আর কদিন এখানে চলবে?

মতির মৃতদেহ আমতলাতেই পড়ে আছে। কত লোক দেখতে আসচে। দূর থেকে দেখে ভয়ে ভয়ে চলে যাচ্ছে। আজ যা ওর হয়েচে, তা তো সকলেরই হতে পারে! ও যেন গ্রামের লোকের চোখ ফুটিয়ে দিয়ে গেল। একটি মূর্তিমান বিপদের সংকেত স্বরূপ ওর মৃতদেহটা পড়ে রয়েচে আমগাছটার তলায়। অনাহারে প্রথম মৃত্যুর অশনি-সংকেত।

দুর্গা ভট্‌চায বললে—তাই তো ভায়া, এখন কি করা যায়?

গঙ্গাচরণ সন্তুষ্ট ছিল না ওর ওপর। একপাল ছেলেমেয়ে নিয়ে এসে ঘাড়ে বসে খাচ্চে এই বিপদের সময়। স্ত্রীর ভয়ে কিছু বলতেও পারা যায় না।

বিরক্ত সুরে বললে—কি আর করা যাবে, সকলের যা দশা, আমাদেরও তাই হবে—

—না খেয়ে আর কডা দিনই বা চলবে তাই ভাবচি। একটা হিল্লে না হলি যাই বা কোথায়?

—একটা হিল্লে কি এখানে বসে হবে, চেষ্টা করে দেখতে হবে।

অনঙ্গ-বৌ কাপড়ের ছোট্ট এতটুকু একটা পুঁটলি হাতে ওদের দেখিয়ে দেখিয়ে বললে—এতে কি আছে বলো তো? জ্যাঠামশাই বলুন তো এতে কি?

—কি জানি কি?

—এতে আছে শসার বীজ, নাউয়ের বীজ আর শাকআলুর বীজ। কাপালীদের ছোট-বৌ দিয়ে গিয়েচে। এ পুঁতে দেবো আমাদের উঠানে।

গঙ্গাচরণ বললে—সে আশায় এখন বসে থাক। কবে তোমার নাউ শসা ফলবে আর তাই খেয়ে দুঃখ এবার ঘুচবে। সবাইকে মরতে হবে এবার মতির মত।

অনঙ্গ-বৌ বললে—হ্যাঁগা, মতির দেহটা ওখানে পড়ে থাকবে আর শেয়াল কুকুরে খাবে? ওর একটা ব্যবস্থা কর।

—কি ব্যবস্থা হবে?

—ওর জাতের কেউ এ গাঁয়ে নেই?

—থাকলেও কেউ আসবে না। কেউ ছোঁবে না মড়া।

—না যদি কেউ আসে, চলো আমরা সবাই মিলে মতির সৎকার করি গে। ওকে অভাবে ওখানে পড়ে থাকতে দেবো না। ও বড় ভালবাসতো আমায়। আমারই কাছে আসতে এলো শেষকালে। ভালবাসতো বড্ড যে হতভাগী—

অনঙ্গ-বৌ আঁচলের ভাঁজ দিয়ে চোখ মুছলে।

হৃদয় সকলের থাকে না, যার থাকে তার আনন্দও যত, কষ্টও তত। অনঙ্গ-বৌ ছট্‌ফট করচে মতির মৃতদেহটা ওভাবে পড়ে থাকতে দেখে। কিছুতেই ওর মনে স্বস্তি পাচ্চে না। ওর নিজের যে সে অবস্থা নয়, তাহলে সে আর ময়না দুজনে মিলে মৃতদেহটার সৎকার করে আসতো।

দুর্গা ভট্‌চায বললে—চলো ভায়া, আমরা দুজনে যাহোক করে ওটির ব্যবস্থা করে আসি।

গঙ্গাচরণ একটু অবাক হয়ে গেল। দুর্গা ভট্‌চাযের মুখে এত পরোপকারের কথা! কিন্তু কার মধ্যে কি থাকে বোঝা কি যায়? সত্যিই সে তা করলেও শেষ পর্যন্ত! দুর্গা ভট্‌চায আর গঙ্গাচরণ আর কাপালীদের ছোট-বৌ।

আরও দু'দিন কেটে গেল।

শোনা গেল গ্রাম ছেড়ে অনেক লোক পালাচ্চে।

রাত্রির মধ্যে অর্ধেক লোক চলে গিয়েচে কাপালীপাড়া থেকে।

কাপালীদের ছোট-বৌ সকালে এসে জানালে অনঙ্গ-বৌকে, সে চলে যাচ্চে।

অনঙ্গ-বৌ বললে—কোথায় যাবি রে?

—সবাই যেখানে যাচ্চে—শহরে! সেখানে গেলে গোরমেণ্টো নাকি খেতে দেচ্চে।

—কে বললে?

—শোনলাম, সবাই চলেচে।

—কার সঙ্গে যাবি? তোর স্বামী যাবে?

—সে তো বাড়ী নেই। সে আজ দিন পাঁচ-সাত বেগুন বেচতে গিয়েচে শহরের হাটে। আর আজও তো ফিরল না।

—কোথায় গেল?

—তা কি করে বলবো? তুমিও যেখানে, আমিও সেখানে।

—তুই যেতে পারবি নে। আমার কথা শোন। ছুট্‌কি, তোর অল্প বয়স, নানা বিপদ পথে মেয়েমানুষের। আমার কাছে থাক তুই। আমি যদি খেতে পাই তুইও পাবি। আমার ছোট বোনের মত থাকবি। যদি না খেয়ে মরি, দুজনেই মরবো।

কাপালী-বৌ সাতপাঁচ ভেবে চুপ করে রইল। অনঙ্গ-বৌ বললে—কথা দে, যাবি নে।

—তুমি যখন বলচো দিদি, তোমার কথা ঠেলতে পারি নে। তাই হবে।

—যাবি নে তো?

—না। দাঁড়াও দিদি, আমি চট করে এক জায়গা থেকে আসি। এখুনি আসচি।

ইটখোলার পাশে অশথতলায় যদু-পোড়া অপেক্ষা করচে। বেলা আটটার বেশি নয়। ওকে দেখে বললে—এই বুঝি তোমার সকাল বেলা? ইটখোলার কুলিদের হাজরে হয়ে গেল, বেলা দুপুর হয়েচে! ওবেলা কখন গাড়ী নিয়ে আসব? সন্দের সময়?

ছোট-বৌ বললে—আনতে হবে না।

যদু-পোড়া আশ্চর্য হওয়ার সুরে বললে—আনতে হবে না গাড়ী? তার মানে কি? হেঁটে যাবে? পথ তো কম নয়—

ছোট-বৌ হাত নেড়ে নেড়ে বেশ ভঙ্গি করে কৌতুকের সুরে বললে—হাঁটবোও না, যাবোও না—

—যাবে না মানে?

—মানে, যাবো না।

যদু-পোড়া রাগের সুরে বললে—যাবে না তবে আমাকে এমন করে নাচালে কেন?

—বেশ করিচি।

কথা শেষ করেই কাপালী-বৌ ফিরে চলে আসবার জন্যে উদ্যত হয়েচে দেখে যদু-পোড়া দাঁত খিঁচিয়ে বললে—না খেয়ে মরছিলে বলে ব্যবস্থা করছিলাম। না যাও, মরো না খেয়ে।

কাপালী-বৌ কোনো উত্তর না দিয়ে হন্ হন্ করে চলে গেল।

যদু-পোড়া চেঁচিয়ে ডাক দিলে—শুনে যাও, একটা কথা আছে—

কাপালী-বৌ একবার দূর থেকে চেয়ে দেখলে পিছন ফিরে। একটু ইতস্ততঃ করলে। তারপর একেবারেই চলে গেল।

শেষ